আলোকবর্তিকা

ছোটোগল্প

তপন কুমার বিশ্বাস

আলোকবর্তিকা

(ছোটোগল্প)

Alokbortika

A collection of small stories.

Price: Rs. 100/-

লেখকঃ তপন কুমার বিশ্বাস

গ্রন্থস্বত্ত্বঃ ডাঃ দীপালী বিশ্বাস

সরোজ পার্ক, বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪

প্রচ্ছদঃ

প্রকাশকঃ

প্রথম প্রকাশ-

৪৫তম কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলা

মুদ্রকঃ

মূল্যঃ ১০০/-

প্রাপ্তিস্থানঃ

আদি পাল ব্রাদারস, কে কে মিত্র রোড, বারাসাত, কলকাতা- ৭০০১২৪

উৎসর্গ

প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক

বন্ধুবর

শ্রী অনীশ ঘোষ

কে

উপক্রমণিকা

‘আলোকবর্তিকা’ আমার দশম গ্রন্থ। ইতিপূর্বে ছোটোগল্প লিখেছিলাম ‘অনাদৃত উচ্ছ্বাস’। এবারও প্রকাশ করতে চলেছি দ্বিতীয় ছোটোগল্পের গ্রন্থ ‘আলোকবর্তিকা’। আমার ছোটোগল্পের শুরুও নেই, শেষও নেই। পাঠকের জন্যে রেখে দিয়েছি অনেকখানি পরিসর। পাঠক যেন আমার অসম্পূর্ণতার জায়গায় ভাবনার সুযোগ পান। তাই গল্প শেষ করেও শেষ হতে দিইনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অমোঘ বাণী ‘শেষ হয়ে হইল না শেষ’ আমাকে বারেবারে মনে করিয়ে দিয়েছে কোথায় আমাকে থামতে হবে অথচ গল্প থামবে না। ছোটোগল্পের আনন্দই এখানে। জীবন তো শেষ হয় না। জীবন এক বহমান নদী। এক কুল থেকে অন্য কুলে বয়ে চলেছে। এক পাড়ের ঘটনার রেষ অন্য পাড়ে গিয়ে সখ্যতা গড়ে নতুন ঘটনার সাথে।

আমার ছোটোগল্পগুলো তুলে এনেছি মানুষের জীবন থেকে। মানুষের অভিমান, আবেগ, অনুভূতি আর অভিজ্ঞতা আমার ছোটোগল্পের উপজীব্য। তাই পাঠক এই গ্রন্থের গল্পগুলোতে অনেক চেনা ঘটনাকে আবিস্কার করতে পারবেন।

পাঠকের ভালোলাগা আমার পরিশ্রমের মূল্যায়ন করবে।

তপন কুমার বিশ্বাস

লেখক পরিচিতি

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস (করোনা যোদ্ধা)

রাজ্য সভাপতি(২০১৮-২০১৯), ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য কমিটি। সভাপতি, ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন, বারাসাত শাখা। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, বারাসাত। প্রাক্তন পৌরপ্রধান পারিষদ, বারাসাত পৌরসভা। প্রাক্তন সদস্য, পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল। প্রাক্তন সম্পাদক,ইয়োর হেলথ,সর্বভারতীয় স্বাস্থ্যপত্রিকা-আই এম এ। আজীবন সদস্য, ইন্ডিয়ান রেডক্রস সোসাইটি। আজীবন সদস্য, সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্স।প্রাক্তন সদস্য, রোটারি ইন্টারন্যাশনাল। প্রাক্তন সভাপতি, স্টুডেন্টস হেলথ হোম, বারাসাত আঞ্চলিক কমিটি। প্রাক্তন সভাপতি, ব্যবসায়ি সমিতি, টাকি রোড, বারাসাত।

লেখক পেশায় একজন চিকিৎসক, একজন দক্ষ সংগঠক, সমাজসেবী ও সুলেখক।

তার ছোটোবেলা থেকেই লেখার অভ্যাস । তিনি স্কুল ও কলেজের পত্রিকাতেও নিয়মিত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন । তিনি একজন ভ্রমণপিপাসু মানুষ। তিনি ভারত বর্ষের প্রায় সকল রাজ্য, বড়ো বড়ো শহর ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ করেছেন সাংগঠনিক, পেশাগত কারণে ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ।

তিনি বিশ্বের অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেনঃ মিশর, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়শিয়া, রাশিয়া, চিন, হংকং, উজবেকিস্তান, ম্যাকাউ, ওমান, ইউরোপের - গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, লিচেনস্টেন, ইতালি, ভ্যাটিকান সিটি প্রভৃতি ।

ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস চিকিৎসা পেশার বাইরে সমাজ সেবার সঙ্গে নিযুক্ত থাকেন। সদালাপী ডাঃ তপনকুমার বিশ্বাস একজন দরদী চিকিৎসক ও সমাজসেবী হিসাবে মানুষের নিকট পরিচিত । পরোপকারী মানসিকতার জন্য সকলের নিকট তার আলাদা ভাবমূর্তি রয়েছে।

তিনি চিকিৎসক সংগঠন ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে ১৯৯৩ সাল থেকে জড়িত। শাখাস্তর থেকে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকেছেন। তিনি বঙ্গীয় রাজ্য আই এম এর রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

তিনি দেশের বাইরে ও সারাদেশের বিভিন্ন জায়গায় সমাজের বিভিন্ন স্তরে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও সমাজ সচেতনতা বিষয়ে বক্তৃতা করতে যান । তিনি রক্তদান আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে জড়িত। তিনি দুঃস্থ শিশু ও মহিলাদের চিকিৎসা ও বিভিন্ন প্রকার সহায়তা ও পরিষেবা প্রদান করে থাকেন ।

তিনি আরও কয়েকজন সমাজসেবীকে সঙ্গে নিয়ে সিনিয়র সিটিজেনস ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন যেখানে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়মিত বিনামূল্যে

চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয় । নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক সেমিনারের আয়োজন করা হয় । সেখানে তিনি বয়স্ক নাগরিকদের চিকিৎসা পরিষেবা সহ অন্য বিভিন্ন প্রকারে সহায়তা প্রদান করেন । তিনি আই এম এ বারাসাত শাখায় বয়স্ক চিকিৎসা কেন্দ্র শুরু করেন। সেখানে প্রবীণ নাগরিকদের বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়, স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

বর্তমান করোনা ভাইরাস আক্রমণের সময়ে তিনি গরিব মানুষের মধ্যে অর্থ বিতরণ করছেন । করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সাধারন মানুষের প্রতিরোধমূলক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তিনি নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । বিভিন্ন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এ সময়ে মানুষের মনোবল বৃদ্ধির জন্য কাজ করছেন । তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অনেক করোনা রোগীর চিকিৎসা করছেন। চিকিৎসকদের সঙ্গে নিয়ে করোনা মোকাবেলায় বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাজ করছেন । বর্তমানে সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের করোনা টিকা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত আছেন। আগামীতে সাধারণ মানুষের জন্য করোনা টিকা দেওয়ার বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণের কাজ শুরু করেছেন।

-- প্রকাশক।

সূচিপত্র
ফুলওয়ালি
কাঁচভাঙা জোছনা
ইজ্জত
এক বিহঙ্গ তনয়া সমাচার
ত্রয়ী চতুষ্কোণ
সাধন ভজন
সূর্যশেখর
প্রহরী
মৃণালিনীর দিগন্ত
বকশিশ
আশ্রমিক
শান্তা এবং চকোলেট
বৃত্তান্তের কাঠগড়ায়
জাস্ট বিয়ার
ওষ্ঠের ভাষা
পুরনো মোবাইল
কনসেপ্ট
সীমারেখা
রানু ও রোদ্দুর
বিবর্ণ চিঠি
মাধু ও প্রজাপতি
অভিযোগ

ফুলওয়ালি

সন্ধ্যা নেমেছে পৌষের আমেজে। বারান্দার শেষ রোদ্দুরটুকু মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। আজকের ফেলে যাওয়া রোদ্দুরগুলো পথের ধার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে গেল ফুলওয়ালি মালতির মেয়ে সোনা। ঘরে ফিরে সে তার মা'কে ডালি সাজিয়ে দেয়। আমি পাশে থাকলে বলতাম, 'মালতি, এ তোমার আগামির পসরা। সোনার কুড়িয়ে আনা মানুষের ভালোবাসা তোমার ভোরের ফুলে ছড়িয়ে দিও। দেখে নিও তোমার ফুল দ্বিগুণ দামে বিকোবে। মালতিকে এ কথা কোনোদিন বলা হয়ে ওঠেনি আমার। আমি যখন ওর বাড়িতে পৌঁছলাম ততক্ষণে ওকে বারুইপুর থানার পুলিশ খুনের দায়ে পুলিশের গাড়িতে করে থানায় নিয়ে গেছে। শেষ দেখা হয়েছিল নবজাগরণ ক্লাবের সংবর্ধনা মঞ্চে যখন জেল থেকে ছাড়া পেল। পাড়ার মানুষ, ক্লাবের ছেলেরা ফুলের মালায় ওকে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

ফুলওয়ালি মালতি তার সোনা মেয়েকে বুকে টেনে বলেছিল, 'তুই আমার ভোরের ফুল, তুই আমার বিকেলের কাঁচা সোনা।'

রাতের বেলা মালতি গরম ভাত আর আলু ভর্তা মেখে তুলে দেয় সোনা মেয়ের মুখে। ঢাকনা সরিয়ে বাটি থেকে বের করে দুটো সেদ্ধ ডিম। খুশিতে ডগমগ সোনা। অনেক দিন পর পাতে ডিম দিয়েছে মালতি। সেদ্ধ ডিম ভেঙে গরম ভাত আলু ভর্তা আর কাঁচা লঙ্কায় মেখে পরম তৃপ্তিতে খায় দুজনে। শীতের রাতে খাবার শেষে দরজার খিড়কিটা ভালো করে লাগিয়ে শুতে আসে মালতি। সোনা ওর মাকে জাপটে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নেয় ।

-'কি করছিস পাগলি আমার? দম বন্ধ হয়ে মরি যাব রে মা।'

-'মা আজ অনেক দিন পর ডিম সেদ্ধ খেলাম।'

-'কি করব বল? ফুল বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। করোনায় গত বছর তো মরতি বসিছিলাম। একসময় ভাবলাম আর তোরে রক্ষে করতি পারলাম না। বদমাশগুলোর করোনার ভয়ডর নেই।'

-'বটিখানা ঠিক করি রাখিস মা। শান দিয়ে রাখিস।'

বলে কাঁথাটা টেনে নেয় বুকের ওপর।

ঘুম আসে না মালতির। সে বার আষাঢ় মাসে সোনার বাবা ধিরু মণ্ডল মাছ ধরতে ডায়মন্ডহারবার গেল। ঝড় উঠল। নৌকো ডুবল। আর ফিরল না । ফি বছর ধিরু কুসুমকুমারী শাড়ি কিনে দিত। রেশমি চুড়ি কিনে দিত । সোনা পেটে আসলে ধিরু মণ্ডল পাশে শুয়ে বলত, 'মালতি, দেখিস আমাদের মেয়ে হবে। ঠিক তোরই মতো সুন্দরী মেয়ে।'

-'না রে আমাদের ছেলে হবে, ধিরু। পেটের মধ্যে এমন জোরে লাফাচ্ছে দুষ্টুটা, ও ঠিক ছেলেই।'

-'না না তোর মতো তেজি মেয়ে এয়েচে তোর পেটে।'

মালতির পেটে হাত বোলাতে বোলাতে কত সে স্বপ্ন, কত সে গল্প, কত সে জেগে থাকা ধিরু মণ্ডলের ।

ও গ্রামের রোশনির বর লখাই সাথে ছিল ধিরু মণ্ডলের মাছ ধরা নৌকোয়। সেও ফেরেনি। রোশনি খুব কান্নাকাটি করল কদিন। তারপর বিয়ে করে নিল পরের বছর।

গুপ্তিপাড়ার ছাব্বিস বছরের লখাই ওকে বৌদি বৌদি করত। সেবার কার্ত্তিক মাসে ভাব জমাতে এসেছিল দুগ্গা পুজোর সময়। লুঙ্গির ওপরে কোমরে লাল গামছা বাঁধা। তেল কুঁচকুঁচ খালি গতর। পুরুষ মানুষের নজর আর ভাবগতিক ছোটোবেলা থেকেই চেনে মালতি। কোন ইশারার কি কথা সব বোঝে সে। সব মেয়েই আস্তে আস্তে বুঝে ফেলে পুরুষের কোন আঙুলে কোন ভাষা। কোন চোখে কোন লালসা। কোন জিভে কোন লালা ঝরে।

-'বৌদি, দাদা তো চলি গেল। আর ফেরবে না। তুমারে একখান কথা বলতি চাই। তুমারে আমি বিয়ে করতি চাই। তুমি তো হিসেব মতো আমার চেয়ে বয়সে ছোটোই হবা, কি বল? তুমি করবা বিয়ে?'

-'দেখ, লখাই তোরে আমি নিজের ভাইয়ের মতো জানি। ওসব ভাবলিও পাপ হবে। তোর দাদা সব দেখতিছে। সব শুনতিছে। বুঝলি?'

লখাই হাল ছাড়ে না। মালতির চেহারায় আগুন। চলনে চপলা হরিণী। এবার রোশনির কাছে গেল লখাই।

লখাই রোশনির ঘরে ঢুকে বলেছিল, 'বৌদি, একবার মালতি বৌদিরে বলি দেখো না। ওরে আমার খুব পছন্দ। ওর যা গতরের রঙ, বয়সটা তো পড়ি আছে। ওরে বিয়ে করে নিতি বল। আমারও বিয়ের বয়স হয়েচে । দেখো যদি রাজি করাতি পার তোমারে ভালো একখান শাড়ি কিনি দেব।'

-'কেন রে লখাই, দূরে যাবি কেন? কাছের টগরফুল চোখি পড়ে না বুঝি? কাছের মেয়েছেলে মনে ধরচে না বুঝি? ক্যান, আমারে তোর পছন্দ হয় না? মালতি বৌদির চেয়ে আমার গতরে কোনও কিছু কম আছে নাকি? মালতির পেটে বাচ্চা, বুঝলি?'

সেদিনের সেই নির্জন দুপুরে নিজের ঘরে রোশনি আঁচল উড়িয়ে দিয়েছিল লখাইয়ের মুখে। অপটু লখাই কেঁপে উঠেছিল ঘরের মাচাংএর মড়মড় শব্দে। ঘেমে উঠেছিল উপোসি কাঁচের চুড়ি ভাঙার শব্দে। আর দেরি করেনি ওরা। পরের রবিবার মা-তারার মন্দিরে গিয়ে বিষ্টু গোসাইকে একশো এক টাকা দিয়ে সিঁদুর পরিয়ে আনল রোশনিকে।

মালতি সব শুনেছে। বিয়ের পথ মাড়ায়নি সে। ও পাড়ার জগাই খুড়ো একদিন এসেছিল ওর বারান্দায়। বিঁড়ি টানতে টানতে বলেছিল, 'মালতি, সোনাকে নিয়ে সংসার চালাবি কি করি বল তো? তার চে সংসার পাত নতুন করে। তোর খুড়িও মরি গেছে কত বছর। দেখ আমারও কত কষ্ট। তোর দুঃখি আমি চুপ থাকতি পারলাম কৈ? চল আমার ঘরে। তোর খুড়ি

মরার সময় রুপোর মাকড়ি রেখে গেছে। রাঁধবি, খাবি। বাচ্চা চাস যদি, তাও চেষ্টা করি দেখতি পারি। কপাল ভালো থাকলি তোর পেটে আসতিও পারে একখান বাচ্চা।

-'খুড়ো তুমি আমার বাবা মতো। তুমি বলতি পারলে এ কথা? গতরে খেটি খাব, খুড়ো। তুমি আর এ বাড়ি এসোনি কোনোদিন।'

সোনাকে বুকে করে বয়ে চলেছে জীবন আর যন্ত্রণা। রোজ মুখোমুখি হয় লোলুপ চোখগুলোর। রাতে দরজায় টোকা পড়ে, চিৎকার দেয় মালতি, 'কোন শুয়োরের খোয়াড় থেকে এয়েচিস? বটি বার করব?' শব্দ থেমে যায়। ডানা ঝাপটে রাতপাখি উড়ে চলে যায় দূরের কোনো গাছে ।

বেড়ে উঠছে সোনা। বয়সে, গতরে, কিশোরী ঝরনার মতো।

করোনার ভয়াল দুর্দিনে যখন মানুষ মরছে, কাজ চলে যাচ্ছে, ওর ফুলের ব্যাবসা পুরো বন্ধ তখন পেট চালানো দায়। কেউ টাকা পয়সা ধার দেয় না।

একসময় মালতি ভেবেছিল, 'আর বাঁচতে পারবনি মনে হয়।'

কত ভোরে ঘনশ্যামের বাগানে ফুল তুলতে যেত। ফুল বেচত। ধিরু আর মালতির সুখের সংসার ছিল।

সেদিন ফুলের ঝুড়ি নিয়ে ট্রেনে চেপে শিয়ালদহ ফুলবাজারে ফুল বেচে বারুইপুর স্টেশনে দুই নম্বর প্লাটফর্মের বাইরে আসতেই বিষ্টু সর্দার বাইকে চেপে এসে মালতির পথ আগলায়। দাঁত বের করে হাসে। বলল, 'চল, ভোম্বলের চায়ের দোকানে। দোকানে বসি তোর সাথে কথা বলব। ডালপুরি ঘুঘনি খাওয়াব, দুধমালাই চা খাওয়াব। আমার বাইকে ওঠ, মাঝেরহাট বাজারে চল ময়নামতি শাড়ি কিনি দেব।'

-'তুই গেলি আমার সামনে থিকি?'

-'শোন একলা মেয়েছেলের অত দেমাগ ভালো না। ধিরু ফিরি আসবে না আর কোনোদিন। কোনো কষ্ট করতি হবে না তোর। তোর সব দায় আমি নেব, খরচা আমি দেব। মাঝে মাঝে দুই এক রাত আসব তোর হাতের পান খেতি। এ কথা কেউ জানবি না। কেউ বুঝবি না। কেউ দেখবি না। তুই রাজি হয়ে যা, মালতি।'

-'আমার ধিরু একদিন ঠিক আসবি। ও আসলি তোর ঠ্যাং ভাঙবি। তোরে কেটে দু'টুকর করবি। তোর ভিটেয় ঘুঘু চরাবি। তুই ভাগ এখান থেকি।'

-'দেখ মালতি, মরদ ছাড়া মেয়েছেলে পচা ডোবায় কলমি শাক। অত তেজ ভালো না রে। রাতি দরজা খুলি রাখিস, আজ আসব বলি রাখলাম।'

আর থাকতে পারে না মালতি । কোমর থেকে ফুলের ডাল কাটার ছুরি বের করে শক্ত করে ধরে।

-'বিষ্টু, ভাগ বললাম। সিধে তোর বুকি বসায়ে দেব, বুঝলি?'

বিটকেল হাসি দিয়ে বিষ্টু পানের পিক ফেলে পথের উপর । রাস্তায় লাল ছোপ ছোপ দাগ।

-‘তোর মতো মেয়েছেলে কি করি কব্জায় নিতি হয় এ বিষ্টু তা ভালো করি জানে।’ বলে উল্টো দিকে বাইক নিয়ে ছোটে।

মালতি ঘরে ফিরে সোনাকে জড়িয়ে ধরে। ভয়ে চোখের জল শুকোয় দু'জনের, তবু মনের সাহস কমে না। রান্না ঘরে বটিখানা দেখে আসে মালতি।

সোনার বয়স তেরো।

মালতির চোখে ঘুম আসে না। মায়ের পাশে শুয়ে আঁধার রাতে সোনা বুঝতে পারে মায়ের চোখে এখনও স্বপ্ন, এখনও জল।

মালতি আজও জেগে আছে একটি প্রশ্ন নিয়ে -

-‘ধিরু তুমি কোথায়? তোমার সোনারে বুকে নিয়ে আমি জেগি আছি গো।’

সোনা বুঝতে পারে তার মায়ের শরীরে এখনো উপচে পড়া যৌবন। বিষ্টু সর্দার, জগা নস্কর কেন ছোঁক ছোঁক করে। বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে কেন ওদের ভাঙা জানলায় দাঁড়িয়ে কাশতে থাকে মাঝরাতে। কেন কুহক পাখির কু ডাক শোনে বাবলার ডালে।

আর মা কেন মাঝরাতে রান্নাঘরে গিয়ে সব্জিকাটা বটিখানা আদর করে।

মা ওকে শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে দুহাতে সব্জি কাটা বটিখানা তুলে ধরতে হয় আর দুপায়ে ভর করে কি ভাবে মা দুগ্গার মতোন দাঁড়াতে হবে ।

মা শিখিয়ে দিয়েছে কি ভাবে পা দুটো শক্ত করে মাটিতে ফেলে বুক চিতিয়ে ওদের রুখতে হবে।

মা শিখিয়ে দিয়েছে কিভাবে পুরুষের লকলকে জিহ্বার দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে দিতে হবে।

করোনা কমেছে। মা শিয়ালদা গিয়েছে ফুল বেচতে।

কাল দুপুরে বিষ্টু সর্দার এসেছিল, ‘সোনা মা, দরজাটা খোল। শালপাতায় মুড়ে লুচি আলুর দম এনিচি। দুখান জিলিপিও এনিচি রে । দরজাটা খোল মা।'

সোনা ডাক শুনে ঘরের খিড়কি খুলে দেয় । কিছু বলার আগেই ঘরে ঢুকে পড়ে । সামনে রাখা টুলের ওপর বসে।

-‘কেমন আছিস রে মা ? এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম । ভাবলাম তোরে এ গুলান দিয়ে যাই আর তোর হাতে একটু জল খেয়ে যাই। দে, এক গেলাস জল দে।’

সোনা টিনের গেলাসে জল এনে বিষ্টু সর্দারের সামনে ধরে।

-‘জলটা রাখ মাটিতে। তুই বস এখেনে। কত ডাগর ডোগর হয়ে পড়িছিস চোখের সামনে । এই নে তোর জন্যি জিলিপি এনিছি। জামা এনিছি। নে।’

বলে সোনার হাতটা ধরে কাছে টানে।

-‘কাকা, ছাইড়ে দেন হাত। আপনি চলে যান। মা নাই। আমি বাড়িত একা।’

হাত ছাড়ে না বিষ্টু সর্দার। শক্ত হয় হাতের জোর।

-'তুই তো বাচ্চা মেয়ে । বস আমার কোলে বস।' তেরো বছরের দুর্বল মেয়ে সোনা কিছু বলার আগেই ওকে এক টানে বিষ্টু সর্দারের কোলের উপর বসায়।

সোনা বিষ্টু সর্দারের কোলের উপর বসতেই কালবৈশাখী ঝড়ের কালো মেঘের কিছু অস্থির অস্তিত্ব বুঝতে পারে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায়।

-'কাকা, আমারে ছাইড়ে দেন।'

বিষ্টু সর্দারের খেয়াল হয় ঘরের দরজা খোলা। উঠে দাঁড়িয়ে এক হাতে সোনার হাত ধরে অন্য হাতে ঘরের দরজা বন্ধ করতে যায় । এই সুযোগে এক ঝটকায় বিষ্টু সর্দারের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দৌড়ে রান্নাঘরে ছুটে যায় সোনা । বটিখানা নিয়ে দু'হাতে ধরে ফিরে আসে । বিষ্টু সর্দারের মুখোমুখি । কাঁপতে থাকে সোনা । জোর হারায় না সে। মা বলেছিল, 'মনের জোর হারাবি না।'

মাটিতে শক্ত দু'পা । উপরে দু'হাতে বটি।

ভড়কে গিয়েছিল বিষ্টু সর্দার তেরো বছরের সোনার মূর্তি দেখে।

ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে শাসিয়ে যায় বিষ্টু।

-'আমিও দেখে নেব রে ছুকড়ি। কি করি শরীর নিংড়ে তেজ বার করতি হয় আমি জানি। কি করি ঠ্যাং মুচড়ে ধরে কচি ফুলের মধু নিতি হয়, আমি ভালো জানি রে।'

এই শনিবার রাতে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে বিষ্টু সর্দার মালতির বুকে ছুরি ধরে। সোনার ফ্রক ধরে টানতে থাকে।

ভয় পায় না মালতি। মরতে তো হবেই একদিন। ছাড়িয়ে নিয়ে রান্নাঘরে ছুটে যায়। রান্নাঘর থেকে বটিখানা এনে বিষ্টু সর্দারের সামনে দাঁড়াল। বিষ্টু সর্দার সোনাকে ছেড়ে বটিখানা ধরে ফেলে মালতির পেটে জোরে লাথি মারে । বটিখানা মালতির হাত থেকে ছিটকে পড়ল। মালতির চুল ধরে টানতে লাগলো, শাড়িতে হাত দিল লখাই। মাথায় রক্ত উঠে এলো সোনার। সোনা এক মুহূর্তে দুর্গা হয়ে গেল। ছুটে গিয়ে বটিখানা তুলে নিল দুহাতে। চালিয়ে দিল বিষ্টু সর্দারের গলায়। চোখ বন্ধ করল রক্তের ফিনকিতে।

বিষ্টু সর্দারের লাশ মেঝেতে নিথর। মাকে জড়িয়ে ধরে অনেক কাঁদল সোনা।

মেঝেতে রক্তমাখা বটির দিকে তাকাল দুজনে চোয়াল শক্ত করে।

পুলিশ নিয়ে যাবার আগে মালতি বলেছে, 'আগে তোর বাবার ভয়ে মাঝরাতে কোনও পুরুষ আসতি পারত না ঘরে।

এখন এ বটিখানার জন্যি মাঝরাতে কোনো পুরুষ আসতি পারবি না তোর ঘরে।'

এরপর আর নতুন কোনো গল্প নয়।

সব মা যা করে মালতি শুধু তাই করেছিল। দারোগা বাবুকে বলেছিল, 'দারোগাবাবু, বটি দিয়ে বিষ্টু সর্দাররে আমি কুপাইছি। সোনারে ছেড়ি দেন। সোনা কুনো দোষ করেনি।'

আমি থানার বড়োবাবু সন্তোষ নাগকে ফোন করেছিলাম,'সন্তোষবাবু, মালতি খেটে খায়। গরিব নির্দোষ বিধবা। দেখুন একে ছেড়ে দেওয়া যায় কিনা।'

-'কি বলছেন আপনি? মার্ডার কেস। ছাড়া যায়? আপনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। আপনি এসব মেয়েছেলে ঘটিত ব্যাপারে জড়াতে যাবেন না। আপনাকে নিয়ে নানান গল্প তৈরি হবে। আপনাকে নিয়ে পাড়ায় পোস্টার লাগাবে বিষ্টুর দল।'

আমি আর কথা বাড়াইনি। আলিপুর জজকোর্টে কেসটা উঠেছিল। আমি আলিপুর কোর্টের উকিল অসীম সামন্ত আমার পরিচিত। তাকে বলেছিলাম, 'দেখুন মালতি গরিব বিধবা, ও খেটে খায়। ওকে একটু সাহায্য করা যায় কিনা।'

-'সাহায্য করাই তো আমাদের কাজ। তবে খরচা কিন্তু অনেক। আপনাকে ভেবে চিনতে নামতে হবে। আর বিষ্টুর দলে অনেক লোক। অনেক দাদা, অনেক নেতা।'

-'আপনি কেসটা লড়ুন। আমি সব খরচা দেব।'

-' ঠিক আছে। তবে আপনার মতো একজন মানুষের এরকম একজন বিধবা মেয়েছেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ! সেটাই ভাবছি।'

-'কি সব ভাবছেন? কি সম্পর্ক? কি বলছেন?'

-'আপনি সম্মানীয় ব্যক্তি। গায়ে কাদা লেগে যায়।'

কাদা লাগার ভয় কার না থাকে। তা ছাড়া বিষ্টুর যা দলবল। দূরেই থেকে সাহায্য করার কথাই ভাবলাম।

অসীমবাবু বললেন, 'আপনি এককালীন কিছু টাকা দিয়ে দিন। আপনার আসতে হবে না। আমি আপনার কেসটা লড়ে দেব।' – এমন ভাবে কথাগুলো বললেন যেন আমার কোনো বিশেষ স্বার্থ আছে আর আমাকেই সাহায্য করছেন। আমি তার হাতে কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে বললাম, 'দেখুন আমার কোনো স্বার্থ নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদে সামিল হতে চাই।'

অসীম সামন্ত বলে উঠলেন, 'কুড়ি হাজার টাকায় মার্ডার কেস? এতো হাত ধুতেই চলে যাবে।'

-'এটা রাখুন। পরে আবার দেওয়া যাবে।' টাকাটা দিয়ে চলে এসেছিলাম।

খুনের দায়ে মালতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে যায়। সোনা বজবজে ওর মামার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আমি এসব কিছুই জানতে পারতাম না। শারীরিক কারণে আমি খোঁজ নিতে পারিনি। আর যদি না বারুইপুর থানার বড়োবাবু আমাকে আলিপুর ফার্স্ট ট্রাক কোর্টের রায়ের ঘটনা না বলতেন।

-‘ জানেন তো মালতির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়ে গেল।’ আপনাকে অসীম সামন্ত অনেকবার ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করে পাননি। টাকার অভাবে নাকি তিনি শেষপর্যন্ত কেসটা ঠিকমত লড়তে পারেননি।

আমি আর কোনো উত্তর দিইনি। বড়োবাবু হয়তো আরও কিছু শোনাত।

চুপ করে গেলাম দুটোদিন। অন্যায় এ ভাবে চলতে থাকবে? মালতি তো আত্মরক্ষায় এটা করেছিল। না হলে ওর মেয়েকে বাঁচাতে পারত না। সঠিক বিচার হবে না?

কলকাতা হাইকোর্টের উকিল রাঘব চ্যাটার্জীর সঙ্গে কথা বললাম। রাঘববাবু বললেন আত্মরক্ষার জন্যে মালতি এটা করেছিল। নিশ্চয়ই জজসাহেব বুঝবেন।

শাস্তি কমে এক বছর হল।

পাড়ায় নবজাগরণ সংঘ আর বারুইপুর মহিলা সমিতি ওদের দুই জনকে সংবর্ধনা দিয়েছিল সাহসিকতার জন্য আর পাড়াটাকে বিষ্টু সর্দারের অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য। আমি খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছিলাম সংবর্ধনা সভায়।

একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। ফুলওয়ালি মালতি ফুলের মালায় ভেসে যাচ্ছে। পাশে চোখের জলে

ভেসে যাচ্ছে সোনা।

আমি দূর থেকে আশীর্বাদ করে ফিরে এসেছিলাম। বারুইপুর মহিলা সমিতির সভানেত্রী রানু মিত্রর সঙ্গে মাঝেরহাটে রক্তদান শিবিরে দেখা। আমাকে বললেন, জানেন, এক ভদ্রলোক মালতির কেসে কোর্টে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তাঁর পরিচয় অজানাই রয়ে গেল। মালতিও তাঁকে চেনে না। আশ্চর্য।’

কাঁচভাঙা জোছনা

ছাদবাগানে বিকেল বেলা পায়চারি করছি। পায়চারি করতে গেলে দৃষ্টি চলে যায় দিগন্ত ছাড়িয়ে নিঃসীমে যেখানে দিকচক্রবাল মিলেছে এক গভীর নিঃশব্দে। যখন সম্বিত ফিরে পাই তখন চোখ পড়তে শুরু করে মানুষের ছাদে। কাছে দূরে। চোখ চলে যায় ঘোষেদের সামনের ঘরে, স্যান্যালবাবুর দখিন জানলায়, হালদার বাড়ির ছাদ বাগানে। তুফান মণ্ডলের বাড়ির ছাদে মেলে দেওয়া রঙিন শাড়িতে, ইউক্যালিপটাস পেরিয়ে দে বাড়ির ফুলের টবে। মিত্তির বাড়ির ছাদে ঝলমল রমণীরা, সুবোধ নস্করের বাড়ির চিলেকোঠায় কপোত কপোতীর লুকোচুরি। একটা ছাদ চোখের সামনে পুরো পৃথিবীটা এনে হাজির করে। তাই তো ছাদ আমায় এতো টানে।

ছাদের কোণে দাঁড়িয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে চোখ মেলে এই কোমল গান্ধার সন্ধ্যায় একটি বিষয় পরিষ্কার বুঝতে পারি যে বাইরের আমি মানুষের কাছে যতো বড়ো, একা আমি এই বিকেলে ততোটাই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট মাত্র। এবার তাকালাম আকাশের মধ্যিখানে, একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে। বহু দূরে মাথার উপরে সপ্তম আকাশে একটি নিশ্চিত সরাইখানার চিত্র দেখতে পাচ্ছি।

কখন যে পেছনে সুহাসিনী এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি।

বলে উঠল সহসাই, 'তোমার চা। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, তোমার ভাবনায় ছেদ পড়বে ভেবে কথা বলিনি। চা যে ঠান্ডা হয়ে যাবে। নাও।'

- 'কিসের আর ভাবনা! ভাবনার কি কূল কিনারা আছে? কি ভাবছি জানো? ভাবছিলাম আজ তোমার সাথে কি কি নিয়ে ঝগড়া হতে পারে। আর ঠিক কখন হতে পারে?'

- 'কিছু পেলে? তুমি তো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলে। আকাশে ঝগড়ার উপকরণ থাকে না। নিচে দেখ। মাটির দিকে দেখ। সংসারে কত ঝড়। ঝগড়া এমনিতেই এসে যাবে। শুধু শুরু করার অপেক্ষা মাত্র।'

-'তা যা বলেছ। অনেক দিন তোমার সাথে ঝগড়া হচ্ছে না। কথা বন্ধ থাকছে না।'

-'কি বললে? ঝগড়া হচ্ছে না? মাথাটা গেছে তোমার। কাল সন্ধ্যায় তো কালীপিসির স্যান্ডেল হারানো নিয়ে আমাকে কত কথা শোনালে। কম ঝগড়া করলে? সব দোষ যেন আমার।'

-' ঝগড়া তো তুমিই করলে। আমি শুধু শুনেই গেলাম। তোমারই তো সব দোষ।'

-'এই শুরু হয়ে গেল। এখন আমার সময় নেই তোমার কথার উত্তর দেওয়ার। পরে বুঝে নেব কার দোষে কালীমাসির স্যান্ডেল হারালো। হাতে অনেক কাজ। এখন নিচে যাই। ড্রাইভারকে ছুটি দিতে হবে। ওর বৌয়ের জ্বর। কাজের মাসি কাল আসবে না। ওর নাতির পৈতে। তারপর নার্সিংহোমে ছুটতে হবে।'

চায়ের কাপ হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিমেষে হন্তদন্ত হয়ে নিচে নেমে গেল সুহাসিনী।

ছাদের উপর ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। নামতেই হবে সংসারে। ওই যে দূরের ছাদে নীল পাঞ্জাবি গায়ে মুরারিমোহন এখনও পায়চারি করছে। তার পত্নীবিয়োগের পর সকলে কত সাধাসাধি কিন্তু সে দ্বিতীয় বিয়ে করল না। পাড়ার রমণীরা তাদের স্বামীদের বলল, স্ত্রীকে কত ভালোবাসে দেখ।

মুরারিমোহন ছাদ ছেড়ে নিচে নেমে যাবে এখনি। আজ শনিবার । ওর অফিসের সিনিয়র তিলোত্তমা নাগ ওর বাড়ি আসবে। বয়স হলে কি হবে, গ্লামার আছে শরীরে ও মনে। ইদানিং শনি রবি মুরারিমোহনের বাড়িতে থেকেও যায় কখনো সখনো। তিলোত্তমা নাগের মেয়ে শর্মিলাও সঙ্গে আসে কোনো কোনো দিন । সেও থেকে যায় মায়ের সাথে মুরারিমোহনের বাড়িতে। আগে সকালে এসে সন্ধ্যায় ফিরে যেত ওরা। এখন সময় বাড়ছে।

পাড়ায় কথা উড়ছে তিলোত্তমাকে মুরারিমোহন বিয়ে করবে। ওদের দুজনকে বাইরে, গঙ্গার ঘাটে, মিলেনিয়াম পার্কে, শপিং মলে, সিনেমা হলে, রেস্টুরেন্টে দেখা যাচ্ছে প্রায়ই। পাড়ায় অনেকেই বলছে এভাবে ঘোরাঘুরির চেয়ে বিয়ে করে নিলেই ভালো। কালীপুজোর রাতে মুরারিমোহন বাড়িতে ছোটো খাটো একটা পার্টি দিয়েছিল। তিলোত্তমা আর শর্মিলা তো ছিলই। শর্মিলার দুই ছেলেবন্ধু রমেশ আর দিগন্তও এসেছিল। শোনা যায় ওদের একজনকেই বিয়ে করবে শর্মিলা। রমেশ ওর অফিস কলিগ। দিগন্ত কলেজ বন্ধু, এখন রিয়েল এস্টেট এর জমজমাট ব্যবসা।

এরমধ্যে একদিন শুনলাম তিলোত্তমাকে মুরারিমোহন ওর বাড়িটা লিখে দিয়েছে ভালোবাসার বিনিময়ে।

মাঝে আমার শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। সুগার আপ ডাউন করছিল, সেই সাথে প্রেশারের টানাপোড়েন।

আজ অনেক দিন পর ছাদে উঠলাম । ও বাড়ির ছাদে নজর গেল। দেখি তিলোত্তমা ছাদে ঘুরছে একা একা। মুরারিমোহনকে দেখছি না। অসুখ করল কি তবে? সিঁড়িতে পায়ের শব্দে বুঝলাম সুহাসিনী উপরে উঠছে।

-'কি হল? তিলোত্তমাদেবীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কি দেখছ?'

-'না না, আমি ভাবছি- মুরারিমোহনের কি অসুখ করল? ওকে দেখছি না যে।'

-'ও মা, তুমি তো পৃথিবীর কোনো খবরই রাখ না। মুরারিমোহনবাবু শর্মিলাকে বিয়ে করে পাড়া ছেড়ে দিয়েছে।'

-'কি বলছ? তা কি করে সম্ভব ! এতো বড়ো খবর আগে বলনি কেন?'

-'শোনো। এ সব খবর ছোঁয়াচে। আমি মরলে যদি তুমি তোমার কোনো বান্ধবীর মেয়েকে বিয়ে করো, তাই তোমাকে বলিনি।'

-'তা যা বলেছ।'

আমি আর কথা বাড়ালাম না।

হিমাচল প্রদেশের সিমলার গ্রান্ড রোডে ঠাকুরদার বাগানবাড়িতে এসে মুরারিমোহন এবং শর্মিলা পাকাপাকি থাকতে শুরু করেছে।

আজ দোল পূর্ণিমা। বিশাল বাগানবাড়ির বাংলোঘরের জানলা ভেদ করে চাঁদের আলো আছড়ে পড়েছে ওদের বিছানায়। এমন উচ্ছল চাঁদ জোছনায় প্রকৃতি ও মানুষে একসময় কোনো তফাৎ থাকে না । ওরা দুজনে জোছনা গায়ে মেখে দ্বাপরযুগের প্রকৃতি হয়ে গেল । চলছে কত্থক নাচের শেষ আবর্ত।

হিমাচলের হিমেল ছন্দে যখন চাঁদ ভেঙে টুকরো টুকরো হতে চলেছে তখন শর্মিলার শিউলি বাগানে নাক ডুবিয়ে মুরারিমোহন বলল, তোমার গন্ধ পূর্ণিমার চাঁদের মতো মিষ্টি। তোমার কবিতাসন্ধিতে কাঁঠালিচাঁপার নেশা।

মেয়েরা চরম কাঞ্জিভরম ঝড়ের উত্তাল মুহূর্তেও সম্বিত হারায় না কখনও।

শর্মিলা বলে উঠল, আপনি গত বছর দোল পূর্ণিমার কাঁচভাঙ্গা রাতে একই কথা মাকেও বলেছিলেন। আমি পাশের ঘর থেকে সব শুনতে পাচ্ছিলাম। আপনি জানতেনই না পাশের ঘরে তখনও দরজা খুলে জেগে আছে একটা বনময়ূরী।

সত্যি করে বলবেন, আমার মায়ের গন্ধ কি আমার চেয়েও বেশি নিপুণ? আমার কাঁঠালিচাঁপা কি মায়ের চেয়ে কম চঞ্চলা?' কেউই ছাদবাগানে বেশিক্ষন থাকতে পারে না। নিচে নামতেই হয়। শীত শীত লাগছে। নেমে গেলাম।

ইজ্জত

‘বেগম সাহেবা, নিশি যে পোহায়ে যায়। জাহাঁপনা যদি এসে পড়েন? আমার গর্দান যাবে। তোমার পেয়ারা খুশবুতে আমি তো মশগুল এখন।’ পরদেশী যুবক বলে ওঠে।

খানসামাকে বলেছিল বেগম, 'যা, ডেকে আন ওরে। ইনাম পাবি অনেক। পহেলা নজরে পরদেশীরে ভালোবেসেছি। বাচ্চা চাই আমি । আমি বাচ্চা চাই একটা। সেই হবে শাহজাদা। তোর জাঁহাপনা বাচ্চা দিতে পারল না আজো।'

হেরেমখানার কুঠুরিতে বোরখা পরে ঢুকেছিল পরদেশী যুবক। তার কাছে কাতর আর্জি ছিল বেগম সাহেবার ‘ভালোবাসি তোমারে। তোমার বুকে ঠাঁই দাও নওজোয়ান। এক খানা কচি বাচ্চা চাই আমার কোলে। তুমিই দিতে পার মহব্বতের ফসল। কিয়ামত পর্যন্ত ভালোবাসব তোমারে।’

-‘দিলরুবা, তোমার সুধা পান করব, তোমার ফসলি জমিতে বীজ বুনে দেবই আমি' বলে ছিল আতর ব্যবসায়ী যুবক।

- ‘জান যায় যাবে। আমি মহব্বতের নিশানা রাখবই । তোমার খায়েশের নফর আমি, দিওয়ানা আমি।’

জাহাঁপনারে খবর দেয় খোচর, 'হুজুর, আপনার খাসতালুকে পরদেশী ঢুকেছে। সুন্দর চেহারার এক তাগড়া জোয়ান আতর ব্যাবসায়ি। বোরখা পরে ঢুকেছে সে। এতো হিম্মত ! হেরেমখানায় ছোটো বেগমের কুঠুরিতে মহব্বতের গোপন মজলিশ চলেছে আজ ক’দিন। দিনের বেলায় তারে লুকিয়ে রাখে খাটিয়ার আড়ালে। এক আয়া তারে খাবার দিয়ে আসে হেঁসেল থেকে। মুরগি মসাল্লাম শরবত বিরিয়ানি কোরমা কাবাব শিরনি। সব খবর নিয়ে এসেছি, আলমপনা ।'

বাইজির বুকে মাথা রেখে সুরা পান করছিলেন জাহাঁপনা। খবর শুনে রেগে গিয়ে বাইজিরে ধাক্কা মেরে তক্তপোষ থেকে নিচে ফেলে দেন। আচানক অস্থির বাগান বাড়ির বাইজি ঘর।

-‘কি বললি? এত নিচে নেমেছে ছোটো বেগম! আমার মহব্বতের কোনো দাম নেই ওর কাছে? মানুষ জানার আগেই গর্দান নেব দু’জনেরই। ইজ্জত যায় আমার তা কি আমার ছোটো বেগম বোঝে না একবারও? ইজ্জত বলে থাকবে কিছু যদি জানে আমজনতা?' কোতোয়াল ছোটে তরোয়াল হাতে হেরেমখানার অন্দরে। তালাশ চলে সকল ঘরে।

কোথাও কাউকে না পেয়ে কোতোয়াল ফিরে আসে খালি হাতে।

-'হুজুর, পালিয়েছে দু’জনেই পিছনের খিড়কি খুলে।'

জাহাঁপনা বলেন, 'তাজ্জব কি বাত ! কোথায় ছিল খোদ পাহারাদার? কি দিইনি তারে? আরাম আয়েশ পোশাক আশাক দু'বেলা খাবার ! ও ব্যাটার আর কি চাই? ধরে আন তারে। ছোটো বেগম পালিয়েছে পরদেশীর হাত ধরে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ।'

কি সর্বনাশ ! খোজা প্রহরীও ভেগেছে বেগমের সাথে । বেগম নিয়ে গেছে তারে। এক সময় পেয়ারের বান্দা ছিল তার। অনুচর খোজা করেছিল তারে জাহাঁপনার নির্দেশে।

-'বেগমের পাহারায় জীবন কাটাবি, ওকে ছুঁতে পারবি না কোনোদিন। এ ছিল শাস্তি।'

ছিঃ ছিঃ পড়ে যায় হেরেমখানায় বাঁদি মহলে। ঢি ঢি পড়ে যায়- জাহাঁপনার খোদ ছোটো বেগম পালাল শেষে?

কমজোর আমাদের জাহাঁপনা।

-'ইজ্জত রাখতে হলে দু'টোরই কল্লা চাই। সূর্য ওঠার আগেই ।'- জাহাঁপনার হুকুম।

সেনাপতি নামেন ময়দানে। খোজাড়ু নামে চারিদিকে। খোঁজ খোঁজ চারিদিকে। দু'টোরই কল্লা চাই।

দুই ছাগল চোর বাঁধা ছিল দরবারে বেশ কিছুদিন।

জাহাঁপনার সম্মান রাখতে সেনাপতি ওদের কল্লা নিতে আসে দরবারের কয়েদখানায়। সেনাপতির পায়ে ধরে কেঁদেছিল ছাগলচোর দুটো, 'মেরো না আমাদের । ঘরে বউ আছে কচি কচি।'

রক্ত মাখা কাপড়ে জড়ানো দুটো কল্লা এনেছিল সেনাপতি। ইজ্জত কা সওয়াল।

জয় হোক জাহাঁপনা- বারবার তিনবার আওয়াজ ওঠে দরবারে ।

চোর দুটোকে ছেড়ে দিয়ে সেনাপতি দুটো ছাগলের মাথা কেটে রক্ত ভেজা কাপড়ে জড়িয়ে পেশ করে জাহাঁপনার সামনে।

জাহাঁপনা প্রায় পাগল ছোটো বেগমের শোকে। সেনাপতির হাতে পিতলের থালায় কাপড়ে জড়ানো কল্লা কার- ছাগলের না মানুষের ? কে নেয় খোঁজ?

মন্ত্রীসভা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। সেনাপতি কল্লা এনে বাঁচাল ইজ্জত- জাহাঁপনার, দেশের ও দশের। ঠিকই তো। ঠিকই তো । ঠিকই তো।

মোকতার বন্ধ দুয়ারে বউরে জড়িয়ে ধরে বলে, 'জাহাঁপনা জিন্দাবাদ।' ঠিকই তো। জাহাঁপনার সম্মানই দেশের সম্মান, দশেরও বটে।

মোকতারের বউও বলে ওঠে, 'জাহাঁপনা জিন্দাবাদ।'

মোকতার বাড়িতে ছিল না এক রাতে। জাঁহাপনার কাছে খবর ছিল আগেই। খানসামা বলেছিল, 'জাঁহাপনা, মোকতারের বউ কুলসুম। বড়োই সুন্দরী, বড়োই কচি, বড়োই তার নখড়া, বড়োই তার ঝাঁঝ। আপনার হেরেমখানায় মানাবে ভাল। ওরে তুলে আনতে পারেন। হুকুম দিলে আজ রাতেই কম্ম কাবার করতে পারি।'

প্রজা পরিদর্শনের নামে জাহাঁপনা এসেছিল সেই রাতে। বাইরে দাঁড়িয়ে প্রহরী পাহারায় । পরীক্ষা ছাড়া কোনও নারী হেরেমখানায় ঢুকতে পারে না। পরীক্ষা হল জবরদস্ত। কুলসুম প্রথমে বাধা দিয়েছিল বেশ। বাধা না দিলে মেয়েছেলের তেজ কিসের, নখড়া কিসের! ফোঁস করলেও পরে অবশ্য নরম মেরে যায় কুলসুম, জাহাঁপনার জোরের কাছে নেতিয়ে পড়ে খানিকটা। জাহাঁপনার বয়স হলে কি হবে। এ ব্যাপারে তাকত এখনও বহুৎ খুব। পরীক্ষায় খুব সুরত কুলসুম বিবি পাস।

ফিরে আসার সময় দুটো মুক্তোর মালা বখশিস দিয়েছিল ওরে।

আর বলেছিল,'পছন্দ তোরে আমার খুউব। তোরে আমার হেরেমখানায় সবার সেরা নীলকুঠরিতে রাখব। আয়েশে থাকবি। পেট ভরে খানা খাবি, গোশত খাবি। গয়না পরবি সারা গায়ে। বাঁদিরা তোরে গোসল করাবে গোলাপ পাপড়ি ভেজা গরম পানিতে। তৈরি থাকিস। এক রাতে আমার বান্দারা এসে গোপনে তোকে তুলে নিয়ে যাবে কালো কাপড়ে মুড়ে। কেউ জানতে পারবে না।'

-'আমার মোকতারের কি হবে? জাহাঁপনা ?'

-'মোকতারের আবার কি হবে? আর একটা শাদি করবে। তা ছাড়া ও তো আমার নকর। নকরি বেড়ে যাবে। তনখা বাড়বে। বেয়াদপি করলে কুমিরের কুয়োয় ফেলে দেব ওকে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে কুমিরের পেটে যাবে।'

ছোটো বেগম জাহাঁপনার সব কিছু জানতে পেরেছিল আগেই। খোচর দিয়েছিল খবর, 'জাহাঁপনা কুলসুমরে আনতে চায়, আপনার পাশের কুঠুরিতে রাখতে চায়। আপনি এখন নাপসন্দ।'

প্রতিশোধ নিল প্রথম সুযোগে। আতর কারবারি নওজোয়ানের কাতর প্রণয়ে।

যমুনায় নৌকো এখন মাঝ দরিয়ায় । রঙিন পালে শীতের উত্তুরে বাতাস লেগেছে। মাঝি একখানা গান ধরেছে।

‘সব কথা ছোটোগল্পে পৌঁছয় না। বুঝলে সঙ্গীতা?’ কথাটি ওকে বলে আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইলাম। পারলাম না। সঙ্গীতা চেপে ধরল আমাকে, ‘আমার কি অপরাধ ছিল, বলুন? আমি তো অরিন্দমকে ভালোবাসতাম মন থেকে।’

‘দেখো, সেই পুরনো কথা তোমাকে আবার বলছি- সব কুঁড়ি ফুল হয়ে ফোঁটে না। সব প্রেমিক পকেটে তাজা গোলাপ রাখে না। এটা তোমাকে বুঝতে হবে।’

‘কিন্তু আমার ভালোবাসায় তো কোনো ফাঁক ছিল না। তবুও ও কেন আমাকে কষ্ট দিত? ওর অবহেলা আমি সহ্য করতে পারতাম না।’ – এ কথা বলে ওর বাঁ হাতটা দেখিয়ে আমাকে বলল, ‘এই দেখুন। ও আমাকে কষ্ট দিলেই আমি ব্লেড দিয়ে হাত কাটতাম।’ আমি চমকে উঠেছিলাম । সঙ্গীতার হাতে ব্লেডের কত কাটা দাগ ! ভাবছিলাম এমনও মেয়ে আছে এত ভালোবাসা বুকে নিয়ে।

নালন্দায় দাঁড়িয়ে অরিন্দম চিঠি লিখেছিল সঙ্গীতাকে। তারপর ট্রেনে চড়ে, রিক্সায় চেপে কিছুটা পায়ে হেঁটে সোজা পৌঁছে গিয়েছিল সঙ্গীতার সামনে পেতে রাখা ঘাসের কার্পেটে। হাঁটু গেড়ে বসে গোলাপ দিয়েছিল ওর হাতে।

সন্ধ্যায় বর্ধমানের সিটি সেন্টারের পাশে ছোটো পার্কে মাধবীলতার ঝোপ। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি সঙ্গীতাকে। তবুও কৃত্রিম অভিমানে বলেছিল অরিন্দমকে, ‘তোমার পথের দিকে তাকিয়ে রয়েছি সেই কখন থেকে।’

-‘আমি তো তোমারই। কত দূর থেকে এলাম বল? সেই কোথায় বিহারের নালন্দা আর কোথায় তোমার বর্ধমান। ঠিক সময়ে পৌঁছব ভাবিনি। কথা তোমাকে দিয়েছি যখন আমি আসবই।’ চোখে জল ধরে রাখতে পারেনি সঙ্গীতা।

চোখের জলের অপর নাম ভালোবাসা- এ কথা সঙ্গীতা বুঝেছিল অনেক কষ্টের বিনিময়ে। আশাভঙ্গের অপর নাম ভালোবাসা – এ কথা বুঝেছিল অনেক শুকনো নদি পেরিয়ে।

এক বুক কষ্টের অপর নাম ভালোবাসা- এ কথা বুঝল বুকের ভেতর অনেকটা রক্তক্ষরণের পর।

পরশু আমাকে সঙ্গীতা বলল, ‘জানেন তো বাবা মা আমার বিয়ের জন্যে ছেলে দেখছে।’

-‘বেশ তো ভালো খবর।’

-‘কনে দেখার আসরে আমি ছেলের মাকে বলেছিলাম যে চাকরিটা ছাড়তে পারব না। এ কথার পর ওরা আর বেশিক্ষণ বসেনি।’

-‘কেন?’

-‘ওরা চায় আমি চাকরি ছেড়ে রান্না ঘরে ঢুকব।’

-'বেশ তো, ক্ষতি কি?'

-'আপনিও এ কথা বলছেন? আপনি না বলতেন- মেয়েদের লেখা পড়া করা উচিৎ? চাকরি করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো উচিৎ?'

-'তোমার মনের জোর দেখে ভালো লাগছে। সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছ। চাকরি ছেড়ো না।'

-'আমার যদি বিয়ে নাও হয় আমি চাকরি ছাড়ব না। আর একটা সত্যি কথা আপনাকে আমি বলি- অরিন্দমের সাথে ব্রেক আপের পর আমার বিয়ে করার কোনো ইচ্ছেই নেই।'

-'তুমি কি অরিন্দমকে ঘৃণা কর?'

উত্তর দেয়নি সঙ্গীতা। ওর চোখের কোণটা ছলছল করে উঠল। বুঝলাম এটাই ভালোবাসার সংজ্ঞা। শত অপরাধেও ক্ষমা করতে পারে, ঘৃণা করতে পারে না একটুকুও।

সঙ্গীতা কাল বিকেলে ফোন করে বলল, 'আমি প্রোমোশন পেয়েছি। এক ধাক্কায় অনেকটা বেতন বেড়ে গেল। চলুন আপনাকে খাওয়াব।'

-'কি আর খাব। খেতেও ইচ্ছে করে না আজকাল।'

-'খাওয়াটা তো একটা উপলক্ষ। আসলে আপনার সাথে আড্ডা দেব। অনেক দিন আড্ডা হয় না আপনার সাথে। কোনো কথা শুনব না। আপনাকে যেতেই হবে।'

'চলো, তোমার মতো কিউট মেয়ের অনুরোধ কি ফেলতে পারি?' আমি রাজি হয়ে গেলাম। ভাবলাম দারুণ একটা মজা হবে নিশ্চয়ই। পরদিন ইকো পার্কের ব্লু হেভেন রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যায় আমি আর সঙ্গীতা নিরিবিলি কেবিনে। চাউমিন
আর চিকেন প্রিপারেসন সঙ্গে কোল্ড ড্রিঙ্কস।

এক পর্যায়ে খেতে খেতে বললাম, 'এবার বিয়েটা করে ফেলো। বলো তো আমি ভালো ছেলে দেখে দিতে পারি। একটা ডাক্তার পাত্র আছে। তুমি বললে যোগাযোগ করতে পারি।'

আমাকে থামিয়ে বলল, 'এখানে আপনাকে শুধু আড্ডা দিতে ডাকিনি। অনেক দায়িত্ব, অনেক কাজ আপনার। ওই তো ওরা এসে গেছে।'

-'কে?' চমকে উঠে রেস্টুরেন্টের দরজার দিকে তাকাই। আমি তো আকাশ থেকে পড়ার মতন।

'তুমি? তুমি অরিন্দম না? এখানে? এ কি চেহারা করেছ? চিনতেই পারছি না তোমাকে। মাথায় লম্বা ঝাঁকড়া চুল, মুখে এক গাল দাঁড়ি। কি উসকো খুসকো চেহারা করেছ। কত রোগা হয়ে গেছ। আট বছর আগে দেখা সে তারুণ্য কোথায় ?'

-'চিনতে পেরেছেন তাহলে? সেই শেষ কবে দেখা হয়েছিল বলুন? ২০১২এর বই মেলাতে আপনি আমাকে অনেক বকেছিলেন সঙ্গীতার সামনেই। আমি গিটার ছাড়তে পারিনি, ছাড়তে পারিনি অনুরাধার দলকে, সত্যি বলতে কি অনুরাধাকেও।'

- 'থাক সে কথা। আগামীর কথা বল, অরিন্দম।' সঙ্গীতা বলে উঠল।

-'বাধা দিও না সঙ্গীতা। আমি ওনাকে সব কিছুই বলতে চাই। ওনার সব জানা দরকার। উনি তোমার সবচেয়ে বড়ো শুভাকাঙ্ক্ষী সেটা আমি জেনে গেছি।'

-'আপনি আমাকে বলেছিলেন, হয় তুমি সঙ্গীতাকে রাখো না হয় অনুরাধাকে। অনুরাধা তখন আমার গিটারখানা জড়িয়ে ধরে শুধুই কেঁদেছিল। আপনার নিশ্চয় মনে আছে সব।' বলেই চলল অরিন্দম।

-'সেদিন সঙ্গীতাকে হাত ধরে টানতে টানতে আমার সামনে থেকে নিয়ে গেছিলেন বইমেলার বাইরে। সঙ্গীতাকে আমি আটকাতে পারিনি। পেছনে অনুরাধা প্রাণপণে আমার জামা টেনে ধরেছিল। সঙ্গীতা আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখেনি। একবার ফোন করেছিলাম, কেটে দিয়েছিল। ব্যাস ওই শেষ।'

এতক্ষণ কথার জন্যে খেয়াল করিনি অরিন্দমের আঙুল ধরে ওর পেছনে সলজ্জে দাঁড়িয়ে একটি বাচ্চা ফুটফুটে মেয়ে।

জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার সঙ্গে মেয়েটি?'

-'ও অনুরাধার মেয়ে। আপনি কিছুই জানেন না? সঙ্গীতা তাহলে আপনাকে কিছুই বলেনি?'

পাশে একটা চেয়ার টেনে অরিন্দমকে বসতে দিল সঙ্গীতা আর মেয়েটিকে নিজের কোলে তুলে নিল ।

-'এরপর আমি আর অনুরাধা কানাডার মন্ট্রিলে চলে যাই। বলতে পারেন অনুরাধাই আমাকে নিয়ে যায়। ওখানে ও একটা চাকরি করত। আর আমি বাউন্ডুলে। গিটার বাজাতাম বারে এবং রেস্টুরেন্টে। কানাডায় অনুরাধার অনেক বন্ধু জুটে গেল । অনেক রাত করে ঘরে ফিরত। জিজ্ঞেস করলে বলত চাকরির জন্যে আসতে পারছে না।

এর মধ্যে অনুরাধা প্রেগন্যান্ট হয়ে পড়ে। ওর কয়েকজন বন্ধু বলেছিল নষ্ট করে ফেলতে। ও রেখে দিল। টিনা জন্ম নিল।'

'টিনা জন্মের পর ওর মধ্যে আরও পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। মদ বন্ধু পার্টি আর চাকরি। রাতে ফোন করলে বলত, ডোন্ট ওরি। তুমি আর টিনা খেয়ে নাও।'

অরিন্দম একটু থেমে বলল, 'গত পয়লা আগস্ট অনুরাধা সকালে ব্রেকফাস্ট করার সময় বলল, আমি চাকরির কাজে টরেন্টোতে যাচ্ছি। ওখানে কিছুদিন থাকব। টিনাকে দেখো।'

অরিন্দমের কথা ভারি হয়ে আসে। তবু বলে চলে, 'টরেন্টো পৌঁছে অনুরাধা একবারই ফোন করেছিল। বলেছিল, অরিন্দম, আমি আর ফিরব না। তোমরা ভালো থেকো। টিনা তোমারই মেয়ে কিনা আমিও জানিনা। তবুও ওকে নিজের মেয়ের মতোই আদর করো। ওই ছিল ওর শেষ কথা। ওকে আর কোনোদিন ফোনে পাইনি। সোমবার অনুরাধার বন্ধু জিন্টা হোয়াটস আপে অনুরাধার ডেথ সার্টিফিকেটের কপি পাঠিয়ে দিয়েছে। করোনা পজিটিভ নিয়ে টরেন্টোর ব্লু-ক্রস হাসপাতালে ভর্তি ছিল।'

সকলেই নিশ্চুপ আমরা নিঃশব্দ কেবিনের মধ্যে। সঙ্গীতা টিনার মুখে চামচ দিয়ে একটু চাউমিন তুলে দিতে চাইল।

আমাদের খাবার কখন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খেয়াল করিনি। অরিন্দমকে একটা গ্লাসে একটু কোল্ড ড্রিঙ্কস ঢেলে এগিয়ে দিলাম।

সঙ্গীতা বলে উঠল- 'আমাকে গত রবিবার কানাডা থেকে ফোন করে অরিন্দম আমাকে সব বলেছে। ও আমাকে জানিয়েছিল, করোনার জন্যে গিটার বাজিয়ে তেমন আয় হচ্ছে না। বার রেস্টুরেন্ট সব প্রায় বন্ধ। আজ একটা পাউরুটি কিনে দুজনে খেয়েছি সারাদিনে। বাচ্চা মেয়েটাকে কি করে বাঁচাব তাই ভাবছি।'

-'আমি ওকে তখনই বললাম, চলে এসো এখানে। কলকাতায় থাকবে। আমি কলকাতায় আছি এখন। ও বলল, কোথায় থাকব? কার কাছে থাকব? হাতে একটা পয়সাও নেই। খাওয়ার টাকা নেই। ফ্লাইটের টিকেট কেনারও টাকা নেই। আমি বললাম, তোমাকে ফ্লাইটের টিকেট অনলাইনে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমরা দুজনেই এখানে চলে এসো।'

-'আমি এয়ারপোর্ট থেকে সোজা পার্ক স্ট্রিটের পার্ক হোটেলে এসে উঠেছি কাল রাতে। সবই তো সঙ্গীতা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। আর বলল আজ এখানে আসতে। আপনার সামনে সব কথা হবে। আপনি নাকি ওর সব সিদ্ধান্ত দেবেন।'

টিনাকে কত যত্নে নিজের কোলে বসিয়ে সঙ্গীতা খাবার তুলে দিচ্ছে দেখে আমার মনটা ভরে গেল। বিল মিটিয়ে আমরা সকলেই পার্ক হোটেলে গেলাম। দোতলায় ঘরে ঢুকে বসলাম কিছুক্ষণ। কিছু কথা হল।

রাত ন'টা হবে তখন, দীপালীর ফোন বেজে উঠল। দীপালীকে জানালাম, 'আসছি এখনি।'

সঙ্গীতাকে বললাম, 'সঙ্গীতা, আমাকেই যখন সিদ্ধান্ত জানাতে হবে, তবে শোনো। তুমি আজ এখানে এদের সাথেই হোটেলে থেকে যাও।'

সঙ্গীতা বাধা দিয়ে কি যেন বলতে যাচ্ছিল। আমি বললাম, 'না, এখন অন্য কোনো কথা নয়। তুমি এখানে আজ রাতে এদের কাছেই থাকবে। তোমার উইমেন্স হোস্টেলে তো এদের থাকতে দেবে না। দুই এক দিনের মধ্যেই সব কাজ ফেলে তোমাদের জন্যে একটা ফ্লাট ভাড়া খুঁজব। সেখানে গিয়ে আপাতত উঠবে তোমরা।'

লিফটে নামিয়ে আমাকে হোটেল গেটে আমার গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেল সঙ্গীতা। গাড়িতে ওঠার আগে ওই আলো আঁধারিতে ওর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'ভালো থেকো। বেস্ট অফ লাক। যত্ন করে রেখো সব।'

সঙ্গীতা আমাকে কোনোদিন প্রণাম করে না। আজ হঠাৎ পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

বাইরে রাস্তাটা অনেক ফাঁকা। করোনার সময় এমনই হয়। খুব তাড়াতাড়ি সব ফাঁকা হয়ে যায়। পার্কস্ট্রিটের রাস্তার আলো আগে কখনও এতটা মোলায়েম মনে হয়নি।

সমুদ্রই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ নারী। সমুদ্রের অভিমান আছে। অহংকার আছে । পুরুষের মন বুঝতে পারে সমুদ্র। অনেক রমণী জানে না যে একা কোনো রমণী সমুদ্রস্নানে নামলে সমুদ্রের ভালো লাগে না।

অদিতি কাপে চা ঢালতে ঢালতে বলল, 'আমিও সমুদ্র হব। আমিও সাইক্লোনের রঙীলা গান শোনাব পুরুষকে।'

অদিতি একটুও না দমে বলল, 'চুনীলালকে আমি কি দিইনি বল ? আমি ওর জন্যে নদীর গান ও ঝর্ণার জলপরি হয়েছিলাম। আমি বনের ফল ও সন্তান দিতে পারতাম চুনিলালকে। পদ্মিনীর কি আছে যা আমার নেই?'

অদিতি শনিবার সান্ধ্য নাট্যশালায় পারঙ্গমা চিত্রাঙ্গদা, সাধন ভজন শিখেছিল কিন্তু চুলে বেণী বাঁধতে জানত না। ডাক্তার বলেছে, পদ্মিনী কোনোদিন গর্ভধারণ করতে পারবে না। আমাকে মেডিকেল রিপোর্ট দেখিয়েছিল। কিন্তু এ নিয়ে ওর আক্ষেপ ছিল না।

পদ্মিনী ক্লাবঘরের সামনে অদিতির সামনেই চুনিলালকে বলেছিল, 'অদিতি তোমাকে যতোই নতুন নতুন উষ্ণতা দিক সমুদ্র কিন্তু আমিই। চুনিলাল, আমি তোমাকে অদিতির হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারি এক লহমায়। ওকে জেদ করতে নিষেধ করে দিও। ওসব ঢং আমার সামনে করতে বারণ করে দিও।' অদিতি কোন উত্তর করেনি।

কাল বিকেলে ওর আর আমার একান্ত আড্ডায় আমি আমার ল্যাপটপ থেকে চোখ না তুলেই গম্ভীরভাবে বললাম, 'চুনিলাল অবশেষে পদ্মিনীকেই বিয়ে করেছে তাহলে? পদ্মিনী অনাথ আশ্রমের একটি মেয়েকে দত্তক নিয়েছে । তুই কি এসব জানিস, অদিতি?'

আমি অদিতিকে বললাম, 'তুই তো জানিস, সমুদ্র সন্তানহীনা। পুরুষের মনে সমুদ্র তাই চিরযৌবনা। সমুদ্রে নামলে রমণীগন্ধ ভুলে যায় পুরুষ। তখন পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে একা বিকিনি সুন্দরী আর সমুদ্র গভীরে তখন সম্ভোগে উত্তাল পুরুষ।'

ওকে মনে করিয়ে দিলাম, 'পদ্মিনী সন্তানহীনা থাকবে আজীবন। সব পুরুষের মনে পদ্মিনীর জন্যে একটা বুনো আকর্ষণ আছে। চুনিলাল সেই আকর্ষণে মজেছে।' অদিতি আমার কথায় খুশী না হলেও আমাদের সান্নিধ্য বেড়েই চলেছে
উত্তরোত্তর।

চুনিলাল অদিতির সামনেই ওর মাকে বলে গেল, 'মাসিমা, সামনের ফাল্গুনে পদ্মিনীর সাথে আমার বিয়ে । আপনারা দুজনেই আমার বিয়েতে যাবেন। অদিতি যেও।'
সেদিন অদিতির স্বপ্নের তাজমহলটা চুরচুর করে ভেঙে পড়েছিল।

সেই থেকে অনেকদিনই, প্রায় প্রতিদিনই ভাঙা তাজমহলের সামনে অদিতির সাথে সময় কাটিয়েছি।

অদিতি আমাকে কাল গভীর রাতে ফোন করে বলল, ‘পদ্মিনী সাঁতার জানত না। চুনীলালকে হোটেলে রেখে কেরালার কোবালাম বিচে একা একা সমুদ্রে নেমেছিল। আর ফিরে আসেনি। চুনীলাল কাল ওর মেয়েকে নিয়ে আমার বাড়ি পৌঁছবে সকালের ফ্লাইটে। ওরা আমার সাথেই থাকবে, আমারই ঘরে থাকবে, আমারই সংসারে সংসার পাতবে বলেছে।’

বাকি রাতটুকু আমার আর ঘুম আসেনি আসন্ন শূন্যতায়। হলফ করে বলতেই পারি অদিতিরও খুব ভালো ঘুম হয়নি সে রাতে, প্রস্তুতির আতিশয্যে।

সাধন ভজন

খন্ড খন্ড মেঘ সুহাসিনীর খুব পছন্দ । কেন পছন্দ- জিজ্ঞেস করলে শুধু হাসে, কোন উত্তর দেয় না। মেঘের মতোই সে হাসি, মিলিয়ে যেতে সময় লাগে ।
এটা ওর একটা আর্ট ।

টি-পট থেকে দিবাকরবাবুর কাপে চা ঢালতে ঢালতে সুহাসিনী তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা বিয়ের কিছুদিন পর স্বামীরা কি বৌয়ের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে?'
-'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন? তোমার নিজের বেলা কি তাই মনে হচ্ছে?'
-'না মানে, আপনি তো লেখেন। নিশ্চয়ই সব বোঝেন আপনি।'
-'কি করে বুঝলে আমি সব বুঝি?' - দিবাকরবাবু বুঝলেন সমস্যাটা সুহাসিনীর নিজেরও ।
-'এখন আর আগের মতো বেড়াতে নিয়ে যায় না। শপিংয়ে গেলে চুড়ান্ত বিরক্ত। এই রকম আরও অনেক কিছুতেই আপত্তি। আগ্রহ বলে কিছু নেই ওর মধ্যে। দু' মিনিটেই দেয়ালের দিকে ফিরে ঘুমোতে শুরু করবে।'
-'বুঝলে - এ সম্পর্কটা চিরকালীন আলুকাবলির মতো। এই ভালো তো এই খারাপ। জীবনটা শরতের মেঘ। এনজয়।'
-'আপনাদের এমন হয়েছে কখনও?'
এ এক কঠিন প্রশ্ন আর তার উত্তর আরও কঠিন দিবাকরবাবুর কাছে ।

এর উত্তর না দিয়ে বললেন- 'এই করতে করতেই দেখবে কখন জীবনের শেষ বাঁকে পৌঁছে গেছ, তখন দেখবে ওইই একমাত্র ভরসা।'
-'তাহলে কি অর্থহীন এ সাধন ভজন?'
উনি ওকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা-
-'ধরো- রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে ড্রেসিং টেবিলে বসে নুপুর সাজগোজ করে, কপালে টিপ পরে, ঘাড়ে গলায় সেন্ট স্প্রে করে – অর্থাৎ ওরা এখনও পুরোদস্তুর রোমান্টিক।
আর-

যশোদা বলে, সাজগোজ তো এখনি সব মুছে ফেলবে, তাহলে কষ্ট করে সেজে কি হবে? – এটা হচ্ছে ঝাল-নুন ছাড়া আলুকাবলি। বুঝলে কিছু?'

দিবাকরবাবুর সাথে কথা বলতে বলতে সুহাসিনীর একটা
ভিডিও কল এল। কেটে দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে এস এম এস করল, 'এক মিনিট পরে কল ব্যাক করছি।'

ওর ব্যাগ থেকে লিপস্টিক বের করে মোবাইলটা সামনে ধরে অতিদ্রুততায় ঠোঁট রাঙিয়ে দিবাকরবাবুকে ইশারায় বসতে বলে পর্দা ঠেলে ওপাশে চলে গেল।

-'হ্যালো, রন্টুদা হঠাৎ এ সময়ে? তোমার দাদা? সে তো অফিসে। আমি? আমি বাড়িতেই আছি। দিবাকর স্যার এসেছেন। ওই তো। চেনো না? উনি নামকরা লেখক। তা অনেকক্ষণ হবে। ওই একটু গল্প করছি আর কি। তোমার ছবিতে লাইক দিয়েছি তো । রাখছি এখন। টেক কেয়ার। বাই।'

দিবাকরবাবুর চা শেষ হয়ে এসেছে। শান্ত স্বরে বললেন, 'সুহাসিনী, আজ উঠি।'

-'এ মা। এতো তাড়াতাড়ি যাবেন? আমাকে নিয়ে কবিতা লিখবেন বললেন। আমি তো আজ কবিতার মুডে ছিলাম। রাগ করেছেন আপনি? ওহো, ভিডিও কল করেছে ও হচ্ছে রন্টুদা, কবি কাম বাচিক শিল্পী। খুব নামডাক। আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব একদিন। সামনের মাসে সুকান্ত সদনে ওর সাথে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে। যাবেন? রন্টুদা আমার রিসেন্ট ফ্রেন্ড। একমাস হলো ফ্রেন্ডশিপ অ্যাকসেপ্ট করেছি।'

পকেট থেকে রুমালটা বের করে কপাল মুছতে মুছতে বললেন, 'আজ উঠি। অন্য আর একদিন লিখব। তবে আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু বেশ মজাদার ছিল, কি বল? কি যেন বললে তখন? - সাধন ভজন। গুড কনসেপ্ট। দিস ইজ লাইফ- আই অ্যাগ্রি । বেশ লাগল তোমার কথাটা।'

সুহাসিনী মেয়েটা ভদ্রতা জানে। ঘরের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর দরজা বন্ধ করল।

গত রোববার বিকেলে আমাকে মমো খেতে ডেকেছিল সুহাসিনী, 'আজ বিকেলে আসুন। রাজিব থাকবে বলেছে। বলেছে- আজ সন্ধ্যায় ওর বন্ধুদের আড্ডায় যাবে না। আমার হাতের মমো খাবে। সুমতি হয়েছে বাবুর।'

বৃষ্টির বিকেলে গরম গরম মমো বেশ লাগছিল। রাজিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরোলাম । সুহাসিনী আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল। দরজায় দাঁড়িয়ে কথাটা বলেছিল আমাকে, 'জানেন? কাউকে বিদায় দেওয়ার সময় মুখের ওপর দরজা বন্ধ করতে নেই। এটা অভদ্রতা। আর শুনুন, এটা আমার বর আমাকে শিখিয়েছে।'

এখন শ্রাবন মাস। যে যাই বলে বলুক এবার কিন্তু প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে বাংলায়। রাতের আঁধার আছে বলেই সকালটা এতো আদরের। আমি আজ ভিজব বৃষ্টিতে কিছুক্ষণ। নন্দিনী আমাকে বলবে, 'ঠান্ডা লাগবে। এ কি পাগলামি করছ?'

সবটা মিলিয়েই যে এ জীবন। বৃষ্টির জল কখনও মিথ্যে বলবে না।

সূর্যশেখর

‘এরা তো আমার সাধারণ বন্ধু । এটা সত্য বা ত্রেতা যুগ নয়, সূর্যশেখর। মাঝে মাঝে তুমি এমন বোকা বোকা কথা বল না, আমি অবাক হয়ে যাই।’- সুদেষ্ণা কথাগুলো সূর্যশেখরকে বলেই এমন একটা হাসি দিল - সূর্যশেখরের মনে হল- ‘সত্যিই তো আমি কি এক হদ্দ বোকা।’

এরপর সূর্যশেখর ওর ঘরে ঢুকে সার্ট প্যান্ট খুলে জানলা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলল আকাশে । নিঃশ্বাস নিল বুক ভরে।

ওয়ার ড্রব খুলে আনকোরা নতুন পোশাক পরল। নতুন একজোড়া জুতো পায়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

এতদিনের ব্যবহৃত আয়নাটা হাতুড়ির এক ঘায়ে ভেঙে ফেলল। কাঁচের টুকরোগুলো খান খান হয়ে সারা মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল। ভাঙা কাঁচের উপর খালিপায়ে হাঁটল সূর্যশেখর, পায়ের পাতায় কাঁচ ফুটে রক্ত ঝরল। সূর্যশেখর রক্তমাখা পায়ের ছাপ আঁকল ঘরের মেঝেতে।

একদিন- কোনো একদিন নতুন সানগ্লাস আর রঙিন টাই পরে সুদেষ্ণার সামনে দাঁড়াল।

সুদেষ্ণার বন্ধুরা সকলে একসাথে হাততালি দিয়ে উঠল, ‘ব্রেভো। এই তো কলির কমলাকান্ত । এসো আমাদের দলে নাম লেখো। কোনো দায় নেই, দায়িত্ব নেই। অঝোর আনন্দে ডুবে যাও।’

একদিন সূর্যশেখরকে খুঁজতে সুদেষ্ণা ওর ঘরে ঢুকে পড়ল সটান। ঘরে ঢুকে দেখে ঘরের মেঝেতে কৃষ্ণচূড়া, পলাশ, রজনীগন্ধা, গোলাপ আরও কত নাম না জানা ফুলের শুকনো পাপড়ির ছড়াছড়ি। সুদেষ্ণা গভীরভাবে পরখ করে দেখল সবগুলো ফুলের পাপড়ি একদিনের নয়। এক এক রকমের ফুলের পাপড়ির বয়স এক এক রকম। ও তার মানে এক একদিন এক একরকম ফুল এসেছিল ওর ঘরে। মাথা ঘুরতে লাগল সুদেষ্ণার।

চিৎকার করে ডাকল সুদেষ্ণা, ‘সূর্যশেখর, তোমার ঘরে তুমি নেই। তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না? তুমি কোথায়?’

-‘এই তো আমি। আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? আর হয়তো চিনতে পারবে না। এটা তো সত্যযুগ বা ত্রেতাযুগ নয়! পাপড়িগুলোকে প্রশ্ন করো। ওরা বলে দেবে সব।’

সেই সূর্যশেখরকে আর কোনোদিন খুঁজে পাওয়া গেল না।

প্রহরী

নিশ্চুপ থাকার মধ্যে একটা মহিমা আছে। নীরবতা একটি বর্ম, একটি আস্তরণ। রক্ষা করতে পারে । ধ্রুব অবলম্বন করেছে বধ্যভূমির মেঘদুত, যখন মৃত মানুষগুলো শুয়ে থাকে মাটিতে, যখন একমাত্র প্রহরী ইতস্তত খুঁজতে থাকে পাপপুণ্যের কুণ্ডলী।

গুটিকতক অর্ধপ্রাণ জীবিত সঙ্গী বধ্যভূমির পাশে কবর খুঁড়ছে ওদের নিহত সঙ্গীদের জন্যে । কবর খোঁড়া শেষে বন্ধুদের লাশ কবরে নামিয়ে রেখে বন্দিশালায় ফিরে যাবে নিঃশেষে।

সামান্য কিছু ঝুরঝুরে মাটির আস্তরণে এরা শুয়ে থাকবে অপেক্ষায় - কাল ওদের আরও কিছু সঙ্গীর জীবনে সমাপ্তি রেখা টানা হবে একই পদ্ধতিতে । তার মধ্যে আজকের এরাও থাকতে পারে যারা ওদের কবর খুঁড়ে গেল ।

এভাবেই চলে আসছে একটা প্রতিবাদহীন পরম্পরা- যুদ্ধের দিনান্তে নিঃশব্দ নাটিকা। এই নাটিকা কেউ লেখে না, কেউ দেখে না। সকলে ব্যস্ত অঙ্ক মেলাতে - কে জিতল কে হারল। সকলে গুনতে ব্যস্ত- 'কত সেনা মরেছে সমরে'। যুদ্ধ শেষে হাতে পায়ে শেকলে যুদ্ধবন্দিরা কোথায় চলল কেউ লেখে না, কারণ সেখানে কান্না থাকে না, বিজয়ীর মালার গন্ধ থাকে না। দুঃখবোধ যেটুকু থাকে তা দিয়ে উদাসী বেহালাবাদক সন্ধ্যা নামলে তার সুর উৎসর্গ করতে পারে বড়োজোর। ব্যস, এই হচ্ছে অন্ধকারের কাহিনি ।

এতোখানি কথা এতোক্ষণ বললাম এজন্য যে ধ্রুব একটা যুদ্ধে হেরে গেছে। ধ্রুব ইদানিং তার প্রেমিকা হারিয়ে এক যুদ্ধবন্দী সেনার মতো হেঁটে যাচ্ছে নিত্য ঢলে পড়া সন্ধ্যার দিকে।

ধ্রুবকে সুলতা বলেছিল,'কবিতায় আর কতো ভোলাবে? অনেক তো হল। এবার আমাকে আমার মতো ভাবতে দাও।'

ধ্রুব আমাকে বলেছে, 'আমি একটা অসমাপ্ত কবর খুঁজে পেয়েছি। বাকিটা আমি খুঁড়ে নেব। আমার প্রিয়তমা নৈঃশব্দ্যে চলে গেছে রঙিন রাজপুত্রের সন্ধানে। শেষের পাতাটা সে পড়বে না জানি। সে ব্যস্ত আগামীর হিসাব মেলাতে। শেষের অঙ্কে সে একঝুড়ি ফুল নিয়ে ভাবতে বসবে – 'কি রঙের কোন ফুলে আমি গাঁথব মালা?'

ফুলওয়ালি তার পাশে বসে আছে আদেশের অপেক্ষায় - কি রঙের কোন ফুল, কোন প্রহরীর কি রঙ?

বেহালাবাদকের সুর শুনতে শুনতে বধ্যভূমিতে পৌঁছে গেলাম এক পূর্ণিমার রাতে। দেখি অনেক মানুষ কবরের পাশে ঘাসে বসে বেহালা শুনছে। আরও কিছু দূরে হেঁটে গেলাম। দেখলাম একটা মেহগনি গাছ আড়াল করে ধ্রুব কবিতা শোনাচ্ছ এক আদিবাসী তরুণীকে।

গায়ের রং চাপা কিন্তু চোখা এবং সুন্দর। কাছে যেতেই ধ্রুব আমাকে বসতে বলল ইশারায়, 'এ হচ্ছে মালতী। আমার কবিতা ওর খুব পছন্দ।'

আমাকে একটু ফাঁকে ডেকে নিয়ে বলল, 'আপনি মনে হয় ভয় পেয়েছিলেন, আমি কিছু একটা করে ফেলি কিনা। ওই তো মালতীকে পেয়েছি, কবিতা শোনাচ্ছি।'

আরও নিচু গলায় বলল, 'আমি ওই কবরের মাটিতে একটা মাধবীলতার গাছ লাগিয়ে এসেছি। সুলতা যদি ফিরে আসে ওর চোখে পড়বে হয়তো।'

মৃণালিনীর দিগন্ত

এ ভাবেই মৃণালিনী গঙ্গার ধারে চলে আসে একা। আজ খুব ভোরে নিজেই গাড়ি বের করেছে গ্যারেজ থেকে। নিজেই ড্রাইভ করে চলে এসেছে বারাসাত থেকে নীলগঞ্জ হয়ে ব্যারাকপুর স্টেশন বাঁয়ে রেখে চিড়িয়া মোড়। এমনটা মাঝে মাঝেই করে সে। গঙ্গার ঘাটে কিছুক্ষণ নিরিবিলতে একান্তে বসে, বাড়ি ফিরে যায় একরাশ প্রশান্তি নিয়ে।

আজ রবিবার মেয়েকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়ার চাপ নেই। ড্রাইভারও আসবে না। গাড়ি বের করে অরিজিৎ সিংয়ের গান চালিয়েছে সাউন্ড সিস্টেমে আর আপন মনে ফাঁকা রাস্তায় হাই স্পীডে হণ্ডাসিটি ছুটিয়েছে । ওর দারুণ লাগে এসি বন্ধ করে গাড়ির কাঁচ নামিয়ে চুল উড়িয়ে বাতাস কেটে এমন ভাবে ফাঁকা রাস্তায় ড্রাইভ করতে।

রাস্তাকে বলেছিল, 'তুই তো দিগন্ত চিনিস। আমাকে তোর দিগন্তে নিয়ে যাবি একদিন? আমি সারাদিন ছুটতে রাজি তোর সাথে।'

মৃণালিনী জানে এ রাস্তা যতই তার বন্ধু হোক ওকে কোনোদিন গোপন ঠিকানা চেনাবে না। কেউই চেনায় না। রাস্তাকে বলেছিল, 'দেখিস একদিন তোর গোপন ডেরায় ঠিক পৌঁছে যাব। দিগন্ত দেখার বড়ো ইচ্ছে আমার। সেখানে তোর কি আছে? আমাকে জানতে হবে সেখানে কে আছে তোর।'

- 'আমার খবর জেনে কি হবে তোমার মৃণালিনী? আমার তো কেউ নেই। পথের কেউ আবার থাকে নাকি?'
- 'সে কি রে। সারাদিন তোর কত মানুষের সাথে জানাশোনা, আনাগোনা, তোর বুকে পদচারণা। আর তুই বলছিস, তোর কেউ নেই?'
- 'এতো শুধু আসা যাওয়া। আমার একাই শুরু। একাই শেষ। ঠিকানা না রেখেই সবাই চলে যায়। ওই যে দিগন্ত ওখানেও কেউ নেই আমার। তোমাকে আমি নিয়ে যাব। দেখে নিও সেখানেও আমি একা।'
- 'আমিও যে একা।'
- 'কেন? তোমার তো পূর্ণ চন্দ্রিমা? কি নেই তোমার? গাড়ি বাড়ি বড়োলোক স্বামী- আর তুমি বলছ, তুমি একা?'

মৃণালিনী একসময় গতি কমিয়ে বাঁয়ে মোড় নেয়। ঠিক সামনে গঙ্গার ঘাট। এতো ভোরে সূর্য ওঠে না, গঙ্গার ঘাটও ফাঁকা।

মৃণালিনী ঘাটে কয়েকটা ধাপ নেমে চেনা সিঁড়ির এক কোণে গিয়ে বসে। এ সিঁড়ি তার অনেক দিনের চেনা। ষোলো বছরের চেনা। সেই থেকে শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কিবা

বসন্ত মন চাইলেই চলে আসে। বুক ভরে শ্বাস নেয়। ঢেউ ছুঁয়ে উঠে আসে ঠাণ্ডা বাতাস। ওর সারা গায়ে আছড়ে পড়ে । যেন কত শান্তি কত সুখ।

কোলাহল নেই। পাশের জামরুল গাছটায় নাম না জানা পাখিরা ডাকছে। যেন কি এক অপূর্ব সিম্ফনি, কি এক মেলোড্রামা।

নদীকে মৃণালিনী বলল, 'ওগো নদী, আমাকে নিয়ে যাবে তোমার মোহনায়?'

- 'কেন গো মেয়ে? তোমারও কেন এমন সর্বনাশা সাধ আমার মতো সর্বস্ব হারাতে? আমার মোহনায় আমি যে সব হারাই সাগরের বুকে।'
- 'তুমিই তো চির সুখী । তোমার মত সুখী কে আছে? তোমার আছে সাগর। তোমার আছে জল। যত ইচ্ছে দিতে পার তাকে। আমার কি আছে? কিছুই তো দিতে পারি না। সব হারাতে পারলেই তো সুখ।'
- 'কি নেই তোমার? তোমার তো সব আছে । ঘর সংসার রাজপ্রাসাদ । বিপুল বৈভব। কিসের অভাব তোমার?'
- 'জানো কি, কোনো কিছুতেই নেই আমার নিঃশেষ অধিকার? নিজের বলে আমার কিছু নেই এ জগতে।'

ভাবতে থাকে মৃণালিনী- আমিও তো হারাতে চেয়েছিলাম। পারলাম কোথায়। নিঃস্ব হতে গেলে মোহনা লাগে। নিজেকে হারাতে গেলে দিগন্তে পৌঁছোতে হয়। আমি তো পেয়েওছিলাম সোনার বিগ্রহ। ধরে রাখতে পারলাম কই? থাকল না সে।

কৌশিক সেদিন বলেছিল, 'আমার হাত ধরো। আমি তোমাকে দিগন্ত দেখাব- পূর্ব দিগন্ত। সেখানে লাল সূর্য ক্ষণিক কথা বলবে তোমার সাথে। পৌঁছোতে হবে সূর্য ওঠার আগে। লাল গাঁদাফুলের মালা নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। সূর্য শুধু লাল গাঁদাফুলের মালা ভালোবাসে।'

মৃণালিনী কপট হাসিতে বলেছিল, 'তুমি কি জানো না কৌশিক, সূর্য বিবাহিতা রমণীদের সাথে কথা বলে না? তাই ওরা ঘোমটা দিয়ে পথ চলে। আমি বিয়ের আগেই সূর্যের সাথে একবার বলতে চাই দিগন্তে গিয়ে।'

- 'আমিই তো তোমার সূর্য। আমি ছাড়া আর কে আছে তোমার শুনি?'

এ গঙ্গার ঘাট যে তার তীর্থ, ঘাটের সিঁড়ি যে তার দিগন্ত, জামরুল গাছের ছায়া তার লাল গাঁদা ফুল।

কৌশিক বলেছিল,'এম বি এ পাস করলেই আমরা বিয়ে করব। মাকে বলেছি তোমার কথা।'

মৃণালিনীও ওর বাবাকে বলেছিল, 'বাবা, আমি আর কৌশিক বিয়ে করব।'

মা বেঁচে থাকলে মাকেই হয়তো বলত কৌশিকের কথা। বাবা বলেছিলেন, 'দেখো মা, অভিরূপ আমার বাল্যবন্ধু । ওর ছেলে বিরূপাক্ষ অনেক বড়ো কর্পোরেটের মালিক। ওর সাথেই তোমার বিয়ে দেব। তোমাকে তো আগে বলেইছি ওর কথা।'

- 'বাবা, আমি তো কৌশিককে ভালোবাসি। আমি অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারব না।'

ওর বাবা চুপ করে থাকেন। অনেক দিন হল ওর মা মারা গেছে হার্ট অ্যাটাকে। সেই থেকে বাবা আর মেয়ের সংসার। মেয়ে কষ্ট পায় এমন কথা কোনোদিন বলেননি হরষিতবাবু।

হরষিতবাবু একদিন বিরূপাক্ষকে বাড়িতে ডেকে বলেছিলেন তার মেয়ে মৃণালিনীর আপত্তির কথা, 'দেখ বাবা বিরু, আমি তো মেয়ের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে পারি না।'

- 'দেখে নেবেন আমি মৃণালিনীকেই বিয়ে করব'- এ কথা বলে বিরূপাক্ষ হনহন করে হরষিতবাবুর সামনে থেকে উঠে বেরিয়ে গেছিল।

ষোলো বছর আগের এক দুপুরে এই গঙ্গার সান বাঁধানো ঘাটে তার সব স্বপ্ন লুঠ হয়ে গেল। তখন দুজনের চপল চোখে ছিল শুধুই স্বপ্ন দেখা। দুজনে এম বি এর ছাত্র। ক্লাস ছুটি হয়ে গেছিল আগেই। কৌশিকের কাঁধে মাথা রেখেছিল নির্জন গঙ্গার ঘাটে জামরুলের ছায়ায়। পেছন থেকে আচমকা একটা গুলির শব্দ শুনেছিল মৃণালিনী। কৌশিক রক্তাক্ত দেহে লুটিয়ে পড়েছে মৃণালিনীর কোলে। কৌশিক অনেক কষ্টে শেষ বিদায়ে বলেছিল, 'মৃণালিনী, আমি চললাম।'

মৃণালিনীর কান্না সেদিন গঙ্গার উপর আছড়ে পড়তে লাগল বারবার আর ঢেউগুলো দু'পারে ডানা ঝাপটাতে থাকে তিরবেঁধা শ্বেতকপোতের মতো।

বিরূপাক্ষ মোবাইলে ফোন করছে, 'মৃণালিনী তুমি কোথায়? বাড়ি চলে এসো তাড়াতাড়ি। আমি একটা কাজে বেরোবো। অনন্যা নাচ শিখতে যাবে। তোমার খোঁজ করছে।'

বিরুর একটা ফোন কলে তার নদীর সাথে গল্প থেমে গেল। তাকে এখন ফিরতে হবে সেই পৃথিবীতে যে পৃথিবীতে ঘাতকের সাথে মা ও মেয়ের নিশিযাপন আরও একটি গর্ভধারণের শরীরচর্চায়।

বকশিশ

তিতলির বিয়ে। নাগের বাজারের রঞ্জিতবাবুর মেয়ে তিতলির বিয়ে আগামী ফাল্গুনে বারুইপুরের রঘুবাবুর মেজো ছেলের সাথে । ম্যাট্রিমনি ডট কমে মেয়ে তিতলির ছবি দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন রঞ্জিতবাবু। নীলমণি ঘটককেও দায়িত্ব দিয়েছিলেন- তিতলির জন্যে ভালো পাত্রের সন্ধান দিতে পারলে বড়ো রকমের ভেট পাবে। অনেক খোঁজ খবর সন্ধানের পর বারুইপুরের সিমেন্ট ব্যবসায়ি রঘুবাবুর মেজো ছেলে ভবেনকে দারুন পছন্দ হয়েছে রঞ্জিতবাবুর স্ত্রী অঞ্জলিদেবীর। আকাশের দিকে দুহাত তুলে নমস্কার করেন দুবেলা আর বলেন, 'ঠাকুর তুমি চোখ তুলে চেয়েছ। এমন ছেলে হাতছাড়া করা যাবে না মোটেই।'

মেয়ের বিয়ের গয়না কিনতে হবে। অঞ্জলিদেবীর বন্ধুর বরের দোকান জানকী জুয়েলার্স কলকাতার বড়োবাজারে। তার দোকানের সোনা নাকি খাঁটি সোনা। রঞ্জিতবাবুকে নিয়ে অঞ্জলিদেবী বেরলেন গয়না কিনতে। দমদম থেকে মেট্রো ধরে এসপ্ল্যানেড পৌঁছলেন। মেট্রো ষ্টেশনের বাইরে এসে একটা ট্যাক্সি নিলেন । মিটার নামিয়ে ট্যাক্সির ড্রাইভার অবিনাশ বলল, 'কোথায় যাবেন, বাবু?' আঞ্জলিদেবী বললেন, 'বড়োবাজারের জানকী জুয়েলার্স'।

বড়োবাজারের জানকী জুয়েলার্সে ঘন্টা দুয়েক ধরে পছন্দ করে মেয়ের গলার কানের হাতের, ছেলের চেন আংটি বোতাম সব কেনা হল। নিজের জন্যেও একটা গয়নার সেট নিলেন অঞ্জলিদেবী। সুন্দর প্যাকেটে সব গুছিয়ে দিয়ে একটা নমস্কার দিল জানকী জুয়েলার্সের সেলস গার্ল তানিয়া।

এদিকে জানকী জুয়েলার্সের বাইরে ওর ট্যাক্সিতে বসে আরামে বিড়িতে সুখটান দেয় ট্যাক্সি ড্রাইভার অবিনাশ। সোনার গয়না কিনছে ওর আজকের প্যাসেঞ্জার। অবিনাশ ভেবেছে নিশ্চয়ই ভালো বকশিস মিলবে আজ।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল। বসে বসে ঝিমুনি এসে গেছিল অবিনাশের। অঞ্জলীদেবীর হাকডাকে অবিনাশের ঝিমুনি ভাঙে । অবিনাশ জিজ্ঞেস করল, 'বাবু কোন দিকে যাবেন ?'

- 'চলো, বসন্ত কেবিনে নামিয়ে দাও আমাদের। খিদে পেয়েছে । কিছু খেয়ে তবে বাড়ি ফিরব।'

অঞ্জলীদেবীর আজ কী আনন্দ! ট্যাক্সিতে যেতে যেতে রঞ্জিতবাবুকে কত কিছু বলতে লাগলেন, 'ভগবান তার মেয়ের জন্য একটা সোনার টুকরো ছেলে এনে দিচ্ছেন। যা গয়না কিনেছি তিতলি আমার কি খুশি হবে! জামাই বেয়াই বেয়ান তারাও নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। ওরা যা দাবি করেছিল তার চেয়ে ঢের বেশি দিচ্ছি। কি বল?' বলেই চলেছেন অঞ্জলীদেবী। রঞ্জিতবাবু চুপচাপ। বা জেটের চেয়ে বেশি খরচা হয়ে গেল সে জন্যেই হয়তো গম্ভীর । কলেজ স্ট্রিটের বসন্ত কেবিনের সামনে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে নেমে গেলেন ওরা ।

বকশিস মেলেনি অবিনাশের। ও চায়ওনি, ভেবেছিল মেয়ের বিয়ের জন্য গয়না কিনছে, হয়ত খুশি হয়েই দেবে। দেয়ও অনেকে। নিজে থেকে চায় না কখনো।

ক্লান্ত অবিনাশ দ্রুত ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলেছে ওর কলোনির দিকে। খিদেও পেয়েছে খুব আর ক্লান্তও। ছুটে চলেছে মিনতির কাছে, ছোটো পল্টু সোনার কাছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর বিশ্রাম চায় একটু।

বিশ্রাম চায় স্বজনের কাছে। করোনা থেকে উঠে আবার ট্যাক্সি চালাতে শুরু করেছে অবিনাশ। অল্পেই দুর্বল বোধ করে অবিনাশ। ডাক্তার বলেছিল কিছুদিন বিশ্রাম নিতে। বিশ্রাম নিলে পেট চলবে কি করে?

কলোনিতে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে নামতে গিয়ে দেখে পেছনের সিটে ওদের ফেলে যাওয়া প্যাকেট। জানকী জুয়েলার্সের গয়নার প্যাকেট। অঞ্জলিদেবীর মেয়ের বিয়ের গয়না।

অবিনাশ ওর বোনের বিয়েতে গয়না দিতে পারেনি তাই বিয়ে ভেঙে গেছিল। গত বছর ওর ট্যাক্সির হেলপার জগাকে নিয়ে কোথায় যে চলে গেল সবিতা, আজও তার কোনো খবর পায়নি অবিনাশ। কেউ বলেছিল, ' জগা বিক্রি করে দিয়েছে তোর বোনকে'। ভোম্বল বলেছিল, 'সে দেখে এসেছে বম্বের গলিঘরের সিঁড়িতে ভরদুপুরে ঠোঁটে লিপস্টিক মেখে বসে আছে অন্য মেয়েদের সাথে'।

চাঁদের উল্টো পিঠে কত কষ্ট - কত কলঙ্ক দেখে এসেছে ভোম্বল বম্বের গলিঘরে। ভোম্বল অবিনাশকে বলেছিল, 'আমি সবিতাকে বিয়ে করব। দিবি তোর বোনকে?'

আবিনাশ তেড়ে উঠে প্রায় মারতে যায় ভোম্বলকে, 'যা ভাগ। সবিতার নাম মুখে আনবি না। অত সুন্দর বোনটি আমার তোর মতো ফুসকাওয়ালার সাথে বিয়ে দেব ?'

ভোম্বল ভালোবাসত সবিতাকে। ভোম্বল কোনদিন সাহস করে বলতে পারেনি সবিতাকে, 'সবিতা, তোকে ভালোবাসি।' সুযোগ পেলেই নানান অজুহাতে ভোম্বলের বাড়ি ঢুকে পড়ত। সবিতা যেদিন জগার সাথে পালাল সারাদিন ফুসকা বিক্রি করেনি, সারাদিন খায়নি ভোম্বল। তারপর একবছর ধরে খুঁজেছে সবিতাকে । খুঁজেছে জগাকে। কলোনির কালীমাসির কাছে খবর পায় জগা বম্বে গেছে সবিতাকে নিয়ে। কালীমাসির সাথে জগার খুব ভাব ছিল – এটা সবাই জানে। কালীমাসির সাথে ভাব জমায় ভোম্বল । ফুসকা দেয়, মাংস কিনে দেয়, রাস্তার মোড় থেকে এগরোল এনে খাওয়ায় । একদিন কালীমাসির হাতে দুশো টাকা দিয়ে বলে, 'জগার মোবাইল নম্বরটা দাও না মাসী। বম্বে যাব বেড়াতে।' কালীমাসির থেকে জগার নম্বর পেয়ে যায় ভোম্বল। পরদিন রওনা দেয় বম্বে। ধারাভি বস্তিতে খুঁজে বের করে জগাকে।

জগাকে জিজ্ঞেস করে, 'সবিতা কোথায় রে?' জগা বলে, 'আমি কি করে জানব- সবিতা কোথায়?' কিছু বলতে চায় না জগা । বুঝতে পারে জোর করে কাজ হবে না, টাকায় চলে দুনিয়া। জগার হাত চেপে ধরে ভোম্বল। ওর হাতে পাঁচশো টাকার একটা নোট গুঁজে

দিয়ে বলে, 'দেখ, আমি সবিতাকে ভালোবাসি। একবার শুধু দেখা করব ওর সাথে। আর কিচ্ছু না।' বম্বের গলিঘরের ঠিকানা দেয় জগা- জাহ্নবী বাঈয়ের তেরো নম্বর কুঠুরি। জগা বলে দেয় ভোম্বলকে, 'দেখ ভোম্বল, গলিঘরে গিয়ে কোনো ঝামেলা করবি না। জাহ্নবী বাঈয়ের ছেলেরা তোর গলার নলি কেটে কুয়োয় ফেলে দেবে। কোনো খবর হবে না কোনোদিন।'

সবিতার ঠিকানা খুঁজে বের করে ভোম্বল। জাহ্নবী বাঈ জগাকে বলে, 'সবিতার রেট আধ ঘণ্টায় এক হাজার টাকা। একদম নতুন জিনিস। যা।' জাহ্নবী বাঈকে এক হাজার টাকা দিলে সবিতার ঘর দেখিয়ে জাহ্নবী বাঈ চেঁচিয়ে বলে, 'সবিতা, নতুন খদ্দের পাঠালাম তোর ঘরে। যত্ন করিস ভালো করে।' ঘরে ঢুকলে সবিতা চিনতেই চায়নি ভোম্বলকে। ভোম্বল বলে, 'সবিতা, তোকে ভালোবাসি আমি। তুই ফিরে চল আমার সাথে।'

সবিতা ক্ষেপে ওঠে ভোম্বলের উপর, 'কাজ করতে এসেছিস কাজ করে চলে যা। ফালতু বকিস না। এক হাজার টাকায় আধ ঘণ্টা বসবি, সব পাবি । নে ওঠ, উঠে বস।' এক ঝটকায় সবিতা প্রস্তুত হয় – ভোম্বলের সামনে মেলে ধরে ওর চন্দননগর। জগা সবিতার হাত চেপে ধরে। অনুনয় করে বলে,'তুই এ কি করছিস? আমি এসবের জন্য আসিনি, সবিতা। অনেক কষ্ট করে তোর ঠিকানা পেয়েছি। তুই ফিরে চল। তোকে নিয়ে ঘর বাঁধব।'

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে সবিতা, 'আমি তো এঁটো হয়ে গেছি রে। তুই কেন নিবি আমাকে? এখানে যে একবার আসে সে আর ফিরে যায় না রে, ভোম্বল। তুই ফিরে যা।'

- 'তোকে আমি বিয়ে করব। ঘর বাঁধব।'
- 'চুপ। শুনতে পারলে তোকে মেরে ফেলবে। পালা এখনি।'

সবিতা চোখ মুছতে মুছতে গলিঘরের মুখ পর্যন্ত পৌঁছে দেয় ভোম্বলকে। জাহ্নবী বাঈ চিৎকার করে ওঠে, 'কিরে পুরোনো নাগর নাকি' দেখ রাণ্ডী, পালানোর কোনো ধুনচুন ফন্দি করবি তো কুকুর দিয়ে খাওয়াব। এখনও কোনো বাপের লাল জন্মায়নি যে এখান থেকে তোকে নিয়ে যাবে।' কাঁদতে কাঁদতে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে সবিতা । বেশি টাকা দিতে চাইলেও সেদিন ভাঙা বুকের উপর আর কোনো খদ্দের বসায়নি।

ভোম্বল বাড়ি এসে কাউকে কিছু বলতে পারে না। শুধু কালীমাসিকে বলেছিল, 'জগা সবিতাকে বেচে দিয়েছে'।

বোন সবিতার মুখ মনে পড়তেই ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবিনাশ ওর ট্যাক্সি নিয়ে ছুটল বসন্ত কেবিনে । মিনতিকে বলে যেতে পারল না কিছু। বসন্ত কেবিনে এসে খুঁজল এদিক ওদিক নিচতলা দোতলা। ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা, দুজন স্বামী স্ত্রী এসেছিল। তারা কি বেরিয়ে গেছে?' ম্যানেজার বলল, 'এই মাত্র বেরিয়ে গেছে ।' দৌড়ে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল। কি করবে ভেবে পায় না অবিনাশ । স্থির করল বড়োবাজার থানায় গিয়ে বড়োবাবুকে সব বলবে। তাহলে বড়োবাবু নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা করবেন।

অঞ্জলিদেবী মেট্রো চড়ে বাড়ি পৌঁছে দেখেন গয়নার প্যাকেট নেই। প্যাকেটটা কোথায়? প্যাকেট নিয়ে নামতে ভুলে গেছেন দুজনেই। শুরু হল অঞ্জলিদেবী আর রঞ্জিতবাবুর ঝগড়া। দুজনে দুজনকে দোষারোপ করা চলল কিছুক্ষণ। এখন কোথায় পাবে ট্যাক্সিওয়ালাকে? কি করবেন বুঝে উঠতে পারছেন না রঞ্জিতবাবু। এরই মধ্যে মোবাইলে এক অচেনা নম্বর থেকে একটা কল এল-' হ্যালো, রঞ্জিত চৌধুরী বলছেন? আপনার কোনো গয়নার প্যাকেট হারিয়েছে? আপনার গয়নার ক্যাশমেমোতে আপনার মোবাইল নম্বর পেলাম। আমি বড়োবাজার থানা থেকে বড়োবাবু বলছি। ট্যাক্সির ড্রাইভার এখানেই আছে। এসে প্যাকেটটি নিয়ে যান।'

- 'এখুনি আসছি।' বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন রঞ্জিতবাবু। অঞ্জলিদেবী বললেন, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব। সব মিলিয়ে দেখতে হবে । তুমি তো এসব কিছু বোঝ না ।'

দুজনেই হাঁপাতে হাঁপাতে থানার বড়োবাবুর ঘরে ঢুকলেন। অঞ্জলিদেবী বললেন, 'কোথায় গয়নার প্যাকেট? দেখি ।'

বড়োবাবু বললেন, 'এই দেখুন আপনাদের গয়নার প্যাকেট। ড্রাইভার নিজেই এসেছে ফেরত দিতে। এমন ভালো মানুষ এখনও আছে, বুঝলেন ?'

প্যাকেট হাতে নিয়ে অঞ্জলিদেবী বললেন, 'আমি গয়নাগুলো মিলিয়ে দেখতে চাই। সব ঠিক আছে কিনা। এই

ড্রাইভার, তুমি যাবে না। এতো টাকার গয়না তো ।' অপ্রস্তুত ড্রাইভার, অপ্রস্তুত থানার বড়োবাবু।

বড়োবাবু বললেন, 'অবশ্যই। আপনারা মিলিয়ে দেখুন । ড্রাইভার যাবে না।' অঞ্জলিদেবী ক্যাশমেমো ধরে মেলাতে বসলেন । বড়োবাবুর টেবিলের উপর একটা একটা করে গয়না রাখতে লাগলেন। রঞ্জিতবাবুকে একটা ধমক দিলেন, 'তুমি চুপ করে বসে আছ কেন? আমার সাথে সাথে মিলিয়ে দেখ না সব ঠিক আছে কি না।'

অঞ্জলিদেবী দেখলেন একটা আংটি অমিল । চিৎকার করে উঠলেন, 'দেখুন দারোগা বাবু, একটা আংটি নেই। ঠিক এই ড্রাইভার সরিয়েছে।'

সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার অবিনাশ বলে উঠল, 'বিশ্বাস করুন দিদি, আমি কিছু সরাইনি। আমি আপনার প্যাকেট খুলিইনি।' থানার বড়োবাবু বললেন, 'আপনি একটু বোঝার চেষ্টা করুন। ও তো নিজেই এখানে গয়নার প্যাকেট নিয়ে এসে হাজির। ইচ্ছে করলে ও পুরো প্যাকেটটাই কাছে রাখতে পারত।'

- 'দারোগাবাবু আপনি জানেন না। ছোটোলকেরা এমনই হয়। লোভ সামলাতে পারে না। একদিকে মানুষের কাছে ভালো সাজার ইচ্ছে। আবার চুরি না করেও থাকতে পারে না। এদের আমি ভালো করে চিনি। এই ড্রাইভার, বের করো আমার আংটি।'

- ‘দিদি, আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? আমার কাছে আংটি নেই। আমি তো প্যাকেটটা খুলিইনি। আমার মনে হয়

গয়নার দোকানে ওরা আপনার জিনিস ঠিকমত দেয়নি । ওখানে গিয়ে একবার খোঁজ করুন।’

- ‘অমনি অন্যদের দোষ দেওয়া শুরু করলে? ঠিক আছে জানকী জুয়েলার্সেই যাচ্ছি, কিন্তু বড়োবাবু, আমরা না আসা পর্যন্ত একে ছাড়বেন না’।

বড়োবাবু বললেন, ‘একে অযথা আটকে রাখব কেন? ওই তো আপনাদের গয়নাগুলো ফেরত দিল ।’

-‘দেখুন বড়োবাবু, আমার হারিয়ে যাওয়া গয়না এর কাছে পাওয়া গেছে। আমার খোয়া যাওয়া আংটি ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত একে আইনত ছেড়ে দিতে পারেন না। আমরা আসছি এখনই।’

ওরা বেরিয়ে গেলেন দুজনে।

অবিনাশ বলল, ‘দেখলেন স্যার, মানুষের উপকার করার হ্যাপা। আমাকে যেতে দিন, করোনা থেকে উঠেছি সবে। সারাদিন খাইনি, খুব দুর্বল। আমি তো সব গয়না ফেরত দিতেই এসেছি ।’

বড়োবাবু বললেন, ‘দেখ, আইন অনুযায়ী তোকে যেতে দিতে পারি না। তোর কাছে হারিয়ে যাওয়া গয়না পাওয়া গেছে। একটু অপেক্ষা কর।’

অবিনাশকে থানার লকআপের বাইরে বসতে বলেন বড়োবাবু ।

অঞ্জলিদেবী পৌঁছে দেখেন জানকী জুয়েলার্স বন্ধ হয়ে গেছে। কাল আসবেন বলে বাড়ির দিকে রওনা হলেন অঞ্জলিদেবী।

এদিকে রাত দশটা বাজল। অবিনাশ আর বসতে পারছে না। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি, খুব ক্লান্ত সে। থানার ডিউটি রুমে গিয়ে দেখে বড়োবাবু চলে গেছে। ডিউটিতে এসেছে অন্য অফিসার। অবিনাশ তাকেই বলল, ‘স্যার আমি বাড়ি যাই। ওরা হয়তো আর আসবে না। ওদের গয়না ওরা পেয়ে গেছে দেখুন।’

ফাইল থেকে চোখ না তুলেই বাইরে দাঁড়ানো সেন্ট্রিকে ডেকে বললেন, ‘সেন্ট্রি, একে আপাতত লকআপে রাখ। কাল সকালে বড়োবাবু এসে যা হয় করবেন।’

অবাক হয়ে অবিনাশ বলল,‘স্যার এ কেমন বিচার ? আমি কোনো দোষ করলাম না। সারারাত লকআপে থাকতে হবে?’

- ‘এই, বেশি কথা বাড়াস না। যা ওর সাথে লকআপে ঢোক। দুই ঘা দিলেই তোর বক্তৃতা থেমে যাবে।’

সেন্ট্রি অবিনাশের কাছ থেকে মোবাইল, টাকা পয়সা যা আছে সেগুলো নিয়ে একটা ধাক্কা দিয়ে লকআপে ঢুকিয়ে দিল। ভেতরে একটা টিমটিমে বাল্ব জ্বলছে। আরও চারজন

ভিতরে বসে আছে লকআপের ঘরের মেঝেতে। ঘরে ঢুকতেই ওদের মধ্যে একজন বলে উঠল, 'কি রে, তোর কি কেস? চুরি না পকেটমার? নাকি রেপ কেস?'

অবিনাশ বলল, 'দেখো ভাই, আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। আমি কিছু করিনি। আমাকে জোর করে লকআপে ঢোকাল।' ওরা চারজন একসাথে খ্যাক খ্যাক করে বিশ্রী ভাবে হেসে উঠল।

- 'শালা সাধু ! এখানে যারাই ঢোকে সব শালা বলে - আমি নির্দোষ, যেন একটা ভগবান।'

অবিনাশ বুঝল এদের সাথে কথা না বলাই ভালো। লকআপের এক কোনে বসে থাকল। একটু পর ওদের জন্য দুটো করে রুটি আর আলু ভাজা দিয়ে গেল- এটাই রাতের খাবার। অবিনাশ বুঝল সারারাত বসেই কাটাতে হবে।

অবিনাশ সেন্ট্রিকে বলল, 'দাদা, আমার মোবাইলটা দেবে? বৌকে খবর দিই যে আজ রাতে ফিরব না।'

- 'তোর বৌয়ের নম্বর বল। আমি খবর দিচ্ছি।' সেন্ট্রি ওর বৌকে খবর দিল, 'তোমার স্বামী বড়োবাজার থানার

লকআপে আছে।' অল্প সময়ের মধ্যেই ছুটতে ছুটতে ওর বৌ চলে এলো থানায়।

মিনতি অবিনাশকে জিজ্ঞেস করে, 'কি করেছ তুমি? কেন এমন হল?' লকআপের লোহার গরাদ ধরে হাউ হাউ করে কাঁদতে থাকে মিনতি। মিনতির কোলে পলটু সোনা সেও কাঁদতে থাকে বাবা মায়ের কান্না দেখে।

- আমি কিছু জানি না রে, মিন্তি। আমাকে এমনিই লক আপে ঢুকিয়ে দিল।'

কিছু বোঝে না পলটু, বুঝতে পারে না মিনতিও ।

কি করে অবিনাশ মিনতিকে বলবে সে কিছু করেনি ? লকআপের আর চারজন আসামি মিনতির দিকে কুৎসিত ইঙ্গিত করে হাসতে থাকে। অশ্রাব্য মন্তব্য করতে থাকে।

-'এ তো মা দুর্গা মাইরি। একটু পা দুটো এগিয়ে দাও মা। পায়ের ধুলো মাখি মুখে।'

-'না না এ তো লক্ষ্মী রে। দাও তোমার পা দুটো এগিয়ে দাও ওর মুখে। ধুলো চেটে চেটে খাক। দেখ, কি ফর্সা পা মাইরি।'

একজন ওর বৌকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'কি দরকার ছিল বাবা, এমন একখানা সুন্দর বৌ থাকতে অন্য মেয়েছেলের দিকে হাত বাড়ানোর?'

আর একজন বলে ওঠে ,'আরে না গুরু, রেপকেস না খেলে পুরুষ মানুষ কিসের? এটা একটা খাঁটি পুরুষ মানুষ। পায়ের ধুলো দাও গুরু।' গা ঘিনঘিন করতে থাকে অবিনাশের।

সেন্ট্রি এসে মিনতিকে সরিয়ে নিয়ে যায়। বলে, 'আজ বাড়ি যাও দিদি। কাল সকালে এসো। কাল সকালে একজন উকিল নিয়ে আসবে আর কিছু খরচাও আছে। সকালে বড়োবাবু আসলে তোমার স্বামী ছাড়া পেয়ে যাবে।'

মিনতি বাড়ি গেল না। ছোটো ছেলেকে কোলে নিয়ে থানার সিঁড়িতে বসে রাত কাঁটায় মিনতি। সকালে অঞ্জলিদেবী আর রঞ্জিতবাবু ছুটলেন জানকী জুয়েলার্সে। ওখানে যেতেই জানকী জুয়েলার্সের মালিক কাচুমাচু হয়ে বললেন, 'দিদি আপনার একটা আংটি রেখে চলে গেলেন। আপনি না আসলে আমিই ফোন করতাম।'

- 'যাক বাবা, যা চিন্তায় পড়েছিলাম !' –আংটিটি নিয়ে বাড়ি রওনা দিলেন

রঞ্জিত দম্পতি এবং ভুলেই গেলেন তাদের অবিমৃষ্যকারিতার জন্য একজন করোনা থেকে সেরে ওঠা ট্যাক্সি ড্রাইভার লকআপে, সেই ড্রাইভারের বৌ তার ছোটো ছেলেকে কোলে নিয়ে থানার সিঁড়িতে সারা রাত। ঘুম ভাঙেনি বড়োবাবুর । এখনও বড়োবাবু ঘুমিয়ে আছেন। বড়োবাবু অনেক রাত করে শুতে যান।

ছেলে কোলে নিয়ে মিনতি ওর কলোনিতে ফিরে যায়। মিনতির কান্না দেখে সকলেই ওর কাছে ছুটে আসে। ওরা বলে হারাধন দাসের কাছে যেতে। হারাধন দা সব ব্যবস্থা করে দেবে। এ পাড়ায় হারাধন দা ভগবান। মিনতি হারাধনদার বারান্দায় বসে অপেক্ষা করতে থাকে। কত মানুষ কত কাজ নিয়ে এসেছে হারাধনদার কাছে। মিনতিকে দেখে হারাধনদা বলে , 'কিরে মিনতি, তোর কি হল?'

কাঁদতে কাঁদতে মিনতি বলে, 'অবিনাশকে থানায় আটকে রেখেছে সারারাত। ওকে ছাড়িয়ে দাও দাদা। তুমি ছাড়া কেউ নেই আমাদের।'

হারাধনদা ইশারায় বসতে বলে। সবাইকে ছেড়ে দেওয়ার পর ঘর খালি হলে জিজ্ঞেস করে, 'বল, অবিনাশ আবার কি করল?'

- 'কিছু করেনি, দাদা। এমনি ধরেছে।'
- 'তাই কি হয় রে? ভালো মানুষকে পুলিশ ধরবে কেন?'
- 'না গো দাদা, ও কিছু করেনি। থানা থেকে বলেছে একজন উকিল নিয়ে যেতে । আর কিছু খরচা পাতি লাগবে। আমি উকিল কোথায় পাব? অবিনাশের করোনা হল, টাকা পয়সা কিছু হাতে নেই।'
- 'সে তো অনেক ঝামেলা রে। অনেক টাকার ব্যাপার।'
- 'দাদা, যা হয় একটা কিছু কর। তুমিই ভরসা।'
- 'ঠিক আছে আমি থানার বড়োবাবুর সাথে ফোন করছি।'

ঘরে উঠে গিয়ে বড়োবাজার থানায় ফোন করল।

বাইরে এসে মিনতিকে বলল, 'খুব বাজে কেস দিয়েছে বুঝলি? ছাড়া পাওয়া মুশকিল। কোর্টে চালান করে দিলে এক মাস জেলে থাকবে ।'

কাঁদতে থাকে মিনতি। মিনতির মাথায় হাত দিয়ে হারাধন দা বলে, 'কাঁদিস না। তুই দুপুরে আমার কলুটোলার গদিঘরে আয়। তোকে উকিলের কাছে আমি নিয়ে যাব। তোর যা গতর

উকিল তোকে এমনই ছাড়বে ভেবেছিস? পরটা ভেজে নেবে।' ভয়ে কাঁদতে থাকে সবিতা, 'কি হবে দাদা?'

- 'কি আর হবে? উকিলকে দিয়েই সব করাতে হবে। আমি আছি না? ভয় কিসের?'
- 'তুমি আমাদের ভরসা দাদা।'
- 'তুই এখন বাড়ি যা। দুপুরে আয়। এখন তো উকিল যেতে পারবে না। আর তোর বাচ্চাটা কে পাশের বাড়ির কারো কাছে রেখে আসিস। ওখানে ছোটো বাচ্চা নিয়ে যাওয়া যাবে না।'

দুপুরে অটোতে করে কলুটোলার গদিঘরে যায় মিনতি । দারোয়ান ভেতরের ঘরে নিয়ে যায় মিনতিকে। দারোয়ানকে মনে হয় বলেই রেখেছিল মিনতির কথা। গদিঘর ফাঁকা শুনশান। একটু কেমন যেন লাগে মিনতির। তবু হারাধনদা ওদের অনেক দিনের পরিচিত। ঘরে ঢুকে দেখে ঘরে আর কেউ নেই, একটা ময়লা চাদর বিছানো খাটে আধ শোয়া অবস্থায় হারাধনদা।

হারাধনদা মিনতিকে দেখে এক মুখ দুশ্চিন্তা নিয়ে বলে, 'মিনতি, অবিনাশ সহজে ছাড়া পাবে না রে। খুব বাজে কেস দিয়েছে পুলিশ। আজ কিছু হবে না।'

- 'তোমার পায়ে পড়ি দাদা। আমরা ভেসে যাব।' বলে হারাধনদার পা ধরে কাঁদতে থাকে মিনতি।

হারাধন দা ওর হাত ধরে উঠিয়ে খাটের কিনারে বসায় মিনতিকে। মিনতির মাথা নিজের কাঁধে রেখে মিনতির পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, 'কাঁদিস না, কাঁদিস না। আমি আছি তো।'

-'মরে যাব দাদা। ও না থাকলে না খেতে পেয়ে মরে যাব।'

মিনতির একটা হাত ধরে কাছে টেনে নেয় নিজের নিঃশ্বাসের আর গায়ের দুর্গন্ধের আওতায়। ডুকরে কেঁদে ওঠে সে।

-'কাঁদলে কি আর অবিনাশকে ছাড়াতে পারবি? কাঁদিস না, কাঁদিস না। ঈশ্বরকে ডাক। আমি আছি তো।'

হারাধন দাস তার অভিজ্ঞ হাতে মিনতিকে অবিনাশের মুক্তির পর্ব একটি একটি করে উন্মোচন করতে থাকে। সংকোচে থরথর করে কাঁপতে থাকে উন্মুক্ত দ্রৌপদী।

মৃদু আপত্তি তোলে মিনতি।

'আমার সাথে পাপ কাজ করবেন না হারাধন দা।'

হারাধন দাস বলেছিল, 'এতো কিছু ভাবলে অবিনাশকে ছাড়াতে পারবি তুই? বললাম তো ঈশ্বরকে ডাক। যা বলি তাই শোন, তাই কর। কেউ জানবে না।' মিনতির মাথাটা টেনে নিয়ে মুখটা চেপে ধরেছিল হারাধন ওর কোলের উপর। ইশারায় সব আদেশ পালন করেছে মিনতি একের পর এক। এক ধাপের পর অন্য ধাপ।

অবিনাশকে ছাড়াতে হবে। আর কোনো কিছুতেই বাধা দেয়নি সে। পরের পর্বগুলোতে ঈশ্বরকে ডাকারও সুযোগ পায়নি মিনতি। ইচ্ছাপূরণ করে গেল বাধ্য হরিণীর মতো।

হারাধন ক্লান্তিতে কিছুক্ষণ নিস্তেজ পড়ে থাকে খাটের ওপর। অবিন্যস্ত মিনতিও। খাট থেকে উঠে পড়ে হারাধন। পাশের ঘরে গিয়ে ফোন করে থানায়। মিনতি তখনও ক্লান্ত বিদ্ধস্ত আধো ঘুমে। ডেকে তোলে ওকে। মেঝেতে পড়ে থাকা শাড়ি ব্লাউজ তুলে দিয়ে বলে, 'তাড়াতাড়ি ঠিক করে নে। যা বাড়ি চলে যা। থানার বড়োবাবুকে বলে দিয়েছি। অবিনাশ বাড়ি পৌঁছে যাবে এখনি।'

বিদ্ধস্ত মিনতি শাড়িটা পরে কোনমতে নিজেকে গুছিয়ে নেয়। একটা টোটোতে তুলে দেয় হারাধন। টোটোখানা আগেই ঠিক করা ছিল। একশো টাকা ভাড়া দিয়ে টোটোওয়ালাকে বস্তিতে পৌঁছে দিতে বলে।

টোটো থেকে নেমে দেখে অবিনাশ বসে আছে বারান্দায়। উঠে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এতবার ফোন করলাম ধরলি না কেন? এতক্ষণ হারাধনদার কাছে ছিলিস মিনতি? তোর একি চেহারা? একি হাল? কি হয়েছে তোর?'

'এখনই এসেছ? তোমাকে ছাড়ানোর জন্যে হারাধনদার কাছে গিয়েছিলাম।'
ধপাস করে বসে পড়ে অবিনাশ।

মিনতির চোখের জলের ধারায় পৃথিবী ভিজতে থাকে থাকে ক্রমাগত। উঠোনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে নির্বাক নিশ্চল । অবিনাশ মিনতির হাতটি ধরে অস্ফুটে বলে, 'ঘরে চল।' অবিনাশ ওকে ঘরে নিয়ে খাটে বসায়।

"থানার বড়োবাবু আমাকে বলল, 'হারাধনবাবু এইমাত্র ফোন করেছেন। তোর বউই সব ব্যবস্থা করেছে। যা বাড়ি যা।" ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে থাকে অনেকক্ষণ।

আলনা থেকে একটা শাড়ি এনে ওর হাতে দিয়ে বলে, 'যা চান করে এটা পরে নে। আর ওই শাড়িটা বাইরে কোথাও ফেলে আসিস।'

তখন বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে।

আশ্রমিক

সুজাতা অতীনকে বলেছিল, 'ওরা কিছু না, কেউ না, অতীন। একঝাঁক পায়রা। জাস্ট আমার ফ্যান। আমি ওদের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাই। এতেই আমার আনন্দ। আমি আনন্দ পাই তা তুমি চাও না, অতীন?'

অতীন বলেছিল, 'তাহলে তুমি তোমার পায়রা নিয়ে থাক। আমি বসলাম ল্যাপটপের সফটওয়ারে।' মুখ ঘুরিয়ে অতীন বসল উল্টো হাওয়ায়।

এই হল সুত্রপাত। লাস্ট ল্যাপের দৌড়। যখন ওরা ঠিক করছে বিয়ে কোথায় হবে- কোনো পাঁচ তারা হোটেলে না রিসর্টে, যখন ওরা ঠিক করছে হানিমুন কোথায় হবে- হাওয়াই না হনলুলু তখনই নামল মুষলধারে বৃষ্টি।

বালির তৈরি মৎস্যকন্যার মতো সাজানো প্রতিমা ভেসে গেল সমুদ্রের সামান্য ঢেউয়ে।

অতীন আর সুজাতার ইগো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন করে ফেললো ওদের তিন বছরের প্রেম, মান অভিমান, স্বপ্নের রংমহল।

সুজাতাকে বললাম,'পাগলামী করিস না, সুজাতা। অতীন তোকে চাতকপাখির মতো ভালোবাসে।'

- ‘কেন আমার বন্ধু থাকতে পারে না? কবিতা পড়ি। বন্ধুদের শোনাই, ভালো লাগে – এই তো? এটা ওর অপছন্দ। আমার স্বাধীনতা বলে কিছু থাকতে নেই?’
- ‘দেখ সুজাতা, পূর্ণ স্বাধীনতা বলে যা ভাবছিস তেমন নয়। স্বাধীনতা মানে সঠিকভাবে কর্তব্য পালন। সব নিজের খুশী মতো হবে এমন নয়। অতীন ওর সকল অতীত ত্যাগ করেছে- সেটা ভুলে গেলি?’
- সে তো ওর অতীত। অতীত কি ও মুছে ফেলতে পারবে? আর আবৃত্তি আমার বর্তমান। এটা ভবিষ্যতে পা বারাবে। দু’টোকে গুলিয়ে ফেলবেন না।

চোখের জল মুছে সুজাতা বলল, আমি বুঝতে পারি অতীন আমাকে বিয়ে করে কোনোদিন সুখী হবে না। কিন্তু ওই যে তিন বছরের প্রেম- তার জন্যেই বিয়ে করা। আমি বুঝেছি বিয়ের পরদিনই আমাদের প্রেমের ছুটি। শুরু হবে অধিকার আর অস্তিত্বের স্তাবকতা।

গাড়ি চালিয়ে যখন গন্তব্যের নিকটবর্তী, তখন সকলে একটু ক্লান্ত, আনন্দের আতিশয্যে যখন সকলে

আত্মহারা তখনই ঘটে দুর্ঘটনা। যত বিচ্ছেদ সবই লাস্ট ল্যাপে, চুড়ান্ত ধাপে -দৌড় যখন প্রায় শেষের পর্যায়ে ।

বিজয়ের কাছে পৌঁছেও বিজয়স্তম্ভ অধরা থেকে যেতে দেখেছি- না বুঝল সুজাতা, না বুঝল অতীন।

ফোন আসল দীপঙ্কররের, 'সুজাতা, আজ বিকেলে কি করছিস? চল সব বন্ধু মিলে ইকো পার্কে- ওপেন এয়ার প্রোগ্রাম। অপুর জন্মদিন। ওখানেই একটু মজা করব। লাবনী ঘোষের রবীন্দ্রসঙ্গীতের আয়োজন করা হয়েছে। প্রীতম তোর কথা বলছিল, আসিস।' এরপর ফোন আসল ঋত্বিকের, পূজার, নীলা বউদির, প্রীতমের, সুমন্ত্রের। সকলের একঝাঁক অনুরোধ, 'আসতেই হবে তোকে।'

বিকেল থেকে সাজতে থাকে সুজাতা। মা জিজ্ঞেস করে, 'মা কোথায় যাচ্ছিস, সুজাতা? অতীনের সাথে দেখা করতে? এ সময়ে বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে নেই। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি ফিরে আসিস।'

মায়ের কোনো কথার উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল সুজাতা।

রাত দশটা বেজে গেল। সুজাতা বাড়ি ফিরছে না দেখে দুশ্চিন্তায় সুজাতার বাবা মা। সুজাতার মোবাইল সুইচড অফ। সুজাতার মা অতীনকে ফোন করল, ' বাবা অতীন, সুজাতা এখনো বাড়ি ফেরেনি। সুজাতা কি তোমার সঙ্গে আছে?'

- 'দেখুন ওর কোনো বন্ধুর বাড়ি গেছে হয়তো।'
- 'ওর কোনো বন্ধুর বাড়িতে এতো রাত করে না কখনো।'

কিছুক্ষণের মধ্যে সুজাতার বাবা মা একটা ট্যাক্সি নিয়ে অতীনের বাড়ি এসে হাজির।

- 'বাবা অতীন, সুজাতার মোবাইল সুইচড অফ। ওর কোনো বন্ধুই ওর খবর দিতে পারছে না। সকলেই এড়িয়ে যাচ্ছে।'

সারারাত কলকাতার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরল। অবশেষে থানায় একটা মিসিং ডায়েরি করে যার যার বাড়ি ফিরল ওরা।

পরদিন অতীন চলে এলো সকাল সকাল। এসে সুজাতার বাবার সঙ্গে পরামর্শ করছে- কোথায় কোথায় যেতে পারে সুজাতা, আর কোথায় খুঁজতে হবে ওকে। এরই মধ্যে কলিং বেল বেজে উঠল। সকলেই ভাবল এই মনে হয় সুজাতা ফিরল। অতীন নিজেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলল। দরজা খুলে দেখে গেরুয়া পোশাক ও পাগড়ি পরিহিত এক সৌমকান্তি যুবক।

যুবকটি বলল, 'দাস বাবু বাড়ি আছেন? আমি রামদয়াল আশ্রম থেকে এসেছি।'

দাস বাবু বাইরে এসে দাঁড়ালেন দরজায়। দাসবাবু বললেন, 'বলুন। আমি দাসবাবু।'

- 'সুজাতা দাস আপনাদের মেয়ে?'
- 'হ্যাঁ। কোথায় আছে সুজাতা?'
- 'সুজাতা আমাদের রামদয়াল আশ্রমেই আছে। এই ফরমটাতে একটা সই করে দিন। আমাদের ওখানে আশ্রমিক হতে গেলে আপনার একটা সই লাগবে। আপনিই তো সুজাতার অভিভাবক।'

অতীন বলল, 'আমি যাব। আমি সুজাতাকে ফিরিয়ে আনব।'

দাসবাবু অতীনকে বাধা দিয়ে বলল, 'কোনো লাভ হবে না অতীন। আমি সুজাতাকে চিনি। আমি ওর বাবা। অনেক ভেবে চিন্তেই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিশ্চয়ই। ও আর হয়তো ফিরবে না।'

- 'আপনি বলছেন এ কথা? বাবা হয়ে নিজের মেয়ের জীবন এ ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে দেবেন?'

রামদয়াল আশ্রম থেকে আগন্তুক যুবক বলল, 'রামদয়াল আশ্রমে অনাথ শিশুদের যে স্কুল আছে সেখানে তাদের লেখাপড়ার সামগ্রিক দায়িত্ব নিয়েছে সুজাতা।'

অতীন বলল, 'আপনি ওখানে কি করেন বলুন তো?'

- 'আমিও ওই অনাথ শিশুদের পড়ানোর দায়িত্বে আছি। আমি একজন শিক্ষক ওখানকার। আমি এবং সুজাতা ওই অনাথ শিশুদের স্কুলটাকে গড়ে তুলতে চাই। এটাই আমাদের আশ্রমের গুরুদেবের ইচ্ছা।'

আর কোনো কথা না বাড়িয়ে অতীন দ্রুত দাসবাবুর বাড়ি ত্যাগ করল।

শান্তা এবং চকোলেট

ধীমান শান্তার হাত থেকে চকোলেটটা নিতে চাইছিল না, ইতস্তত করছিল। কতদিন পর দেখা ওদের। কি ভেবে ওর হাতের মুঠো থেকে সবকটা চকোলেটই তুলে নিল ধীমান।

শান্তা মনে মনে বলল, 'তুমি আমার সব নিঃশেষ করে নাও, ধীমান। আমার হাতে যে সেই চেনা ফাল্গুনের পরাগ লেগে আছে।'

ধীমান ওকে বলল,'শান্তা, তোমার পথের শেষ প্রান্তে বালি কাঁকর দেখে ভেবো না- এখানেই সব শেষ। ভেব না এর পরেই তো সাগরের পাগলামো, কী হবে সামনে তাকিয়ে। জেনো, সাগরের ওই প্রান্তে আর একটি পথ অপেক্ষা করে আছে নতুন পদচিহ্নের আশায়।'

শান্তা ধীমানের হাত থেকে একটি চকোলেট তুলে নিয়ে তার খোসা ছাড়িয়ে সাহস করে চকোলেটটা ধীমানের দুই ঠোঁটের মাঝে গলিয়ে দিয়ে বলল,'আমি যে সাগরের ওপার দেখতে পাইনে। আমার দৃষ্টির সীমা ছিল তোমার কবিতার শেষ লাইন পর্যন্ত। আবার কোনো নতুন পথে পা দিতে ভয়, বড্ড বেশি ভয়। যদি আবার পিছলে যাই। বারবার আঘাত সহ্য করার মতো সাহস আমার নেই, ধীমান।' ধীমান প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাইল । বলে উঠল,'আমি জার্মানি থেকে ছুটি নিয়ে আসলাম। তুমিও এ সময়ে ব্যাঙ্গালোর থেকে কলকাতা আসলে। কি অদ্ভুত কাকতালীয় না? না হলে এবারও তোমার সাথে দেখা হত না।'

- 'ধীমান, এখনও তোমার আসা যাওয়ার পায়ের শব্দ শুনতে পারি। তোমাকে চোখের দেখা দেখব বলেই চলে এসেছি ব্যাঙ্গালোর থেকে। তোমার মায়ের থেকেই জেনেছি- তুমি আসছ।'

শান্তা একটু চুপ করে থেকে বলল,'তুমি জার্মানি কবে ফিরে যাবে?'

-'বাবার হার্টের বাইপাস অপারেশন করিয়েই ফিরে যাব।'

-'এখন তো কেরিয়ার গুছিয়ে নিয়েছ। বিয়ে করছ কবে? নাকি বিদেশিনী কাউকে জুটিয়েছ জার্মানিতে?'- শান্তা জিজ্ঞেস করল।

ধীমান কোনো উত্তর দেয় না। শান্তার চোখে অনেকগুলো প্রশ্নের জন্ম দিয়ে সেদিনকার মতো বিদায় নিল ধীমান। কাল রাতে এস এম এস করল ধীমান, 'শান্তা, কাল দুপুরে পিটার ক্যাটএ এসো। এক সাথে লাঞ্চ করব। জার্মানি যাওয়ার সময় হয়ে এলো।'

শান্তা ভুলতে পারে না সেদিনের অপমান। সমস্ত সম্পর্ককে অস্বীকার করে জার্মানি চলে গেছিল ধীমান। মোবাইলে জানিয়েছিল শান্তা, 'আমার করোনা পজিটিভ। ডাঃ দিবাকর বাড়িতে এসে দেখে গেছেন। তুমি আমাকে এমন অবস্থায় ছেড়ে চলে যাবে? আমি হয়ত বাঁচব না, ধীমান।'

কত সহজে সেদিন বলতে পারলে, ‘এই করোনার মধ্যে একটাই ফ্লাইট দিয়েছে। আর কবে ফ্লাইট কেউ বলতে পারে না? মিস করলে আমার কেরিয়ারটা ধাক্কা খাবে।’ সুদেষ্ণা আর তুমি পাড়ি দিলে বার্লিন। ঘেন্না এসে গেছিল নিজের জীবনের উপর। ঘেন্না এসে গেছিল পুরুষ জাতটার উপর। তবুও রাতের এস এম এস উপেক্ষা করতে পারল না শান্তা। ধীমানের কথা যে তার কাছে বীজমন্ত্র। ধীমানের ভালোবাসা যে তার কাছে মীরার ভজন। ধীমানের ভালোবাসা তার কাছে যে দোলপূর্ণিমায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। তাই তো এতো সহজে ফিরিয়ে দিতে পেরেছিল ধীরাজ নস্করের লাল গোলাপ, অরিন্দম চৌধুরীর কৃষ্ণচূড়া, বিনীত সিংয়ের ইউরোপের হাতছানি, সি ই ও পদের অফার। পরদিন দুপুরে লাঞ্চ হল পিটার ক্যাটে। তারপর দিন আইনক্সে মুভি দেখল, পপকর্ণ খেল । তারপর দিন লং ড্রাইভে টাকি গেস্ট হাউজ। বিকেলে নদীর পাড়ে বসে নরম ঘাসে হাত বোলাতে বোলাতে শান্তাকে বলেছিল, ‘ইছামতির তীরে গেস্ট হাউজ কি রোমান্টিক দেখেছ? চলো, আজ রাত এখানেই থেকে যাই। কাল সকালে ফিরব।’

রাতে থাকতে রাজি হয়নি শান্তা। বাড়ি ফিরে এসেছিল ওরা। ড্রাইভ করতে করতে বাঁ হাত দিয়ে শান্তার ডান হাতটা চেপে ধরে ধীমান বলল,‘কাল ফিরে যেতে হবে। রাতে ফ্লাইট। সব গুছিয়ে নিতে হবে। শান্তা তুমি আমাকে এয়ারপোর্টে সি-অফ করতে যাবে না?’ খুব নিচু স্বরে শান্তা বলেছিল, ‘যাব।’

শান্তা সন্ধ্যায় ধীমানের বাড়িতে পৌঁছে গেল । ধীমানের মা বলল, ‘এসেছ মা শান্তা? ধীমান বারবার তোমার কথা বলছে যে তুমি ওর সাথে এয়ারপোর্টে যাবে।’

- ‘হ্যাঁ মাসিমা।’

ব্যাগেজ গুছিয়ে নিল ধীমান। ট্যাক্সি এসে গেছে। বাবা মাকে প্রণাম করে ট্যাক্সিতে উঠল দুজনে। সারাপথ কোনো কথা হল না ওদের। এয়ারপোর্টে পৌঁছে ট্যাক্সি থেকে লাগেজ নামালো ধীমান। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে শান্তার হাত ধরে ধীমান বলল, ‘আবার দেখা হবে। ভালো থেকো।’

ধীমান লাইনের দিকে এগোতে চাইল। শান্তা পেছন থেকে ধীমানের জামা আস্তে টেনে ধরল। ধীমান ঘুরে দাঁড়াল । লাইন ছেড়ে বাইরে এসে শান্তার হাতটি হাতের মুঠোয় নিয়ে ওর চোখে চোখ রাখল। কারও মুখে কোনো কথা সরল না। কেউ কিছু বলতে পারল না। সমগ্র পৃথিবী যেন নীরব হয়ে গেল। শান্তা চোখ নামিয়ে নিল। ওর হাতদুটি ধরে ছিল শান্তা। শান্তার চোখের জল ফোঁটা ফোঁটা ঝরে পড়তে লাগল দুজনের হাতের উপর। এয়ারপোর্টের সামনে এভাবে কত সময় চলে গিয়েছে দুজনের খেয়াল নেই।

-‘ কিরে বাবা ধীমান, ফিরে এলি যে? ফ্লাইট ক্যানসেল বুঝি?’- ধীমানের মা জানতে চাইল।

সে কথার উত্তর না দিয়ে ধীমান বলল, ‘মা, আজ রাতে শান্তা তোমাদের কাছে শোবে। ওকে একটু শুতে নেবে তোমাদের সাথে?’

বৃত্তান্তের কাঠগড়ায়

ভালোবাসতে একটা একান্ত চিলেকোঠা লাগে,
উড়ুউড়ু ময়দানে উত্তরীয় ঝোলানো যায়,
খেলনাবাটি জমে না।
তুমিও বলেছিলে, 'কাঠগড়ার মতো একটা চৌকাঠ বানাও। সেখানে দাঁড়িয়ে একবার অন্ততঃ বল, ভালোবাসি।'

মেহগনি কাঠ আনলাম বন থেকে। কাঠমিস্তিরি আনলাম নগর ছেড়ে মেঠো গ্রাম থেকে। কাঠগড়া বানালাম তিন দিক ঘেরা। পালিশ করলাম - কাঁচ পালিশ। কাঠগড়ায় দাঁড়ালামও কিছুক্ষণ। অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু শব্দ বেরোল না একটিও। ভালোবাসা তো দূর অস্ত।

তুমি সেদিন হাসতে হাসতে চলে গেলে। যাওয়ার আগে বলে গেলে, 'আমি আবার আসব।'

আমি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই রইলাম। সেই মাঘিপূর্ণিমায় তুমি এক ছোট্ট শিশু বুকে চেপে আমার সামনে এসে দাঁড়ালে।
আমি বললাম, 'কে ওর বাবা?'
-'ওর বাবা? কোনো তমাল গাছের তলায় কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে হয়তো।'
-'সে কি? তবে আমি কে?'
-'বাবা হতে চাইলে প্রকৃতি ঘেরা মাঠে নামতে জানতে হয়। তুমি তোমার অহংকারী গন্ডি ছেড়ে পথে পা রেখেছ কোনোদিন যে বাবা হবে? অহংকারী পুরুষ বাবা হতে পারে না। '
-'তবে? কি ওর পিতৃপরিচয়?'
-'কেন ? পিতৃপরিচয় ছাড়া কি পৃথিবী পৃষ্ঠে শিশু বাড়তে পারে না? মাতৃজঠরে বেড়ে উঠলে অথচ মাতৃনামে কেন এত অবজ্ঞা তোমাদের?'
-'আমি জানতে চাই কে ওর বাবা।'
-'কোনো এক অবধূত যুবক এসেছিল কবিতা শুনতে। এটুকু বলতে পারি। এর বেশি কিছু বলব না।'
-'কোথায় সে? সেও কি হারিয়েছে পথ? সেও কি হারিয়েছে ঠিকানা?'
-'সব পুরুষই জীবনের কোনো এক মোড়ে এসে ঠিকানা হারিয়ে পথ হারিয়ে দিওয়ানা হতে ভালোবাসে।'
'তোমার তো অনেক দিওয়ানা। চারিদিকে ছড়ানো। বিছানো।'
'শোনো। সব মেয়েদেরই বহু দিওয়ানা। পুরুষরা আসলে সবাই ভীতু। বলতে সাহস পায় না। তাই জ্বলে পুড়ে মরে।'

- 'আমি কোনোদিনই ভীতু ছিলাম না। কি বল?'

-'হাসালে তুমি। যাই এবার। ওই অবধূত যুবক রাতের খাবার নিয়ে বসে আছে আমার জন্যে।'

-'তুমি যে বললে ও কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আছে?'

-'ও কাঠগড়া ভাঙতে জানে। তোমার মতো চৌকাঠ আঁকড়ে পড়ে থাকে না।'

-'ওর কি আরো রমণী আছে ওর ঘরের পেছনে অমাবস্যার নদীতীরে?'

-'যে পুরুষ একজন নারীকে ভালোবাসতে পারে হৃদয় নিঙড়ে তাকে অনেক নারীই মনে মনে কামনা করে অতীব সঙ্গোপনে। আমার এতে গর্ব হয়। আমার অবধূত যুবক অনেক নারীর কল্পনায় তাদের অমাবস্যার বুকখোলা পুরুষ।'

-'সে কি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসে আমার মতো?'

-'তুমি আমাকে ভালোবাসলে কবে?'

-'তবে আসো কেন আমার কাছে?'

-'সে তুমি বুঝবে না। আমি আজো জানলাম না কেন আসি তোমার কাছে। তোমার না আছে কোনো যন্ত্রণা তোমার না আছে মাঘের শীত। তোমার নিষেধের গন্ধ আমাকে বারে বারে টেনে আনে তোমার কাঠগড়ায়। বল না গো, সব রমণীর কেন আমার মতো মাঘের পূর্ণিমায় অন্ধ হতে ইচ্ছে জাগে? মন ছুটে যায় তার অনাদরের পুরুষের কাছে ? আর চোখের জলে ফিরে আসে তার একান্ত গৃহকোণে?'

জাস্ট বিয়ার

অংশুমান বলেছিল, 'বলো তো রত্না, এ আইসক্রিমের কি রং ?'

রত্না আইসক্রিমে জিভ বুলিয়ে বলেছিল, 'তুমি তো জানো আমি কমলা রঙের আইসক্রিম ভালোবাসি।'

কি করে অংশুমান বলবে যে বেকার যুবকদের মতো সেও মায়ের দেওয়া পকেট মানি থেকে জমিয়েছে আজকের দিনটির জন্যে। একটি গোলাপ, দুটি হাতে দুটি কমলা রঙের আইসক্রিমের স্বপ্ন সেই সঙ্গে রত্নার ঝরে পড়া হাসি । চিত্রকর যেমন রং শুকোলে কান পাতে চিত্রকর্মে মধুর সংলাপের লোভে, তেমন অংশুমান কান পেতে বলেছিল, 'তোমার হৃদস্পন্দন শুনতে পাচ্ছি, রত্না ।'

'রত্না, তোমার রং তুলিতে আমার বুকে জল রংয়ের দুটি আঁচড় কাটো না !- একটি তোমার আর একটি আমার নামে' - একথা বলে অংশুমান সেদিন জামার বোতাম খুলে দিয়েছিল। সেই ছিল পার্কের নিরিবিলি সন্ধ্যায় রত্নার প্রথম জলরংয়ের প্রলেপ, কেঁপে উঠেছিল রত্না। সব মনে আছে।

আজও এসেছে অবিকল সেই সন্ধ্যা। নিজেই ড্রাইভ করে রত্নাকে নিয়ে ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় এসেছে তাজ বেঙ্গলের বলরুমে। মৃদু আলোয় জোড়ায় জোড়ায় ভিড় বাড়ছে সেলিব্রেটিদের।

সেবার অংশুমান রত্নার হাত ধরে বলেছিল, 'আমি চাকরি পেলে আগামী বছর ভ্যালেনটাইন্সে তোমাকে নিয়ে বিয়ার খাব।'

রত্না রেগে গিয়ে বলেছিল,'ও সব খেলে জীবনে তোমার সাথে কথা বলব না।'

ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় একটা গ্লাস নিয়ে এসে রত্নার হাতে দিয়ে বলল, 'কিছু না, জাস্ট বিয়ার।

ওষ্ঠের ভাষা

ওষ্ঠের যদি আলাদা ভাষা থাকত তাহলে জিনিয়া আর তমোজিৎ মাঝখানে বালিশ রেখে ঘুমতো না। আমি অনেক বলেছি, 'জিনিয়া, জীবনানন্দ পড়। তাহলে বুঝবি প্রতিটি নারী শরীর একটি করে প্রকৃতি আর প্রকৃতির ভাষা নারী ওষ্ঠের ভাষা।' জিনিয়া খুঁজে বেড়ায় তাপসের ব্র্যান্ড।

কোন সেন্ট গায়ে মাখে?

কোন গন্ধ লেগে থাকে থাকে তাপসের ওষ্ঠে ?

কার নাম বাতাসে ভাসে তাপসের পাশে?

জিনিয়া তমোজিৎকে বলেছিল, 'সন্ধ্যায় শপিং মলে গিয়েছিলাম সতীশবাবু সাথে। তিনি আমার বাবার বন্ধু।'

-'তাই বলে প্রায়ই যাবে? আমি জানব না কিছু?'

- 'সব কিছু জানাতে হবে তোমাকে? আমার স্বাধীনতা বলে কিছু নেই?'

তমোজিৎ ট্রান্সফার নিয়ে সিমলা অফিসে একমাস হল জয়েন করেছে। আমি বলেছিলাম, 'তমোজিৎ, যেও না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

আমি জিনিয়াকে বলেছি, 'ধৈর্যের আর এক নাম অপরাহ্ন। সকল অপরাহ্ন সুসংবাদের জন্ম দেয়। তমোজিৎ তোর কাছে আসবে খুব তাড়াতাড়ি।'

গত রবিবার জিনিয়া ইউরিন রিপোর্ট দেখিয়ে গেল- প্রেগন্যান্সি টেস্ট পজিটিভ। জিনিয়ার চিবুকে কৃষ্ণচূড়ার লাল আভা। এক লহমায় অভিমান উধাও। খবরটা তমোজিৎকে কিভাবে দেবে ভেবে ব্যাকুল?

একটু আগে সিমলা থেকে খবর এসেছে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে গভীর খাতে উল্টে পড়েছে। ছয়জন যাত্রীর কেউ হয়ত বেঁচে নেই। জিনিয়ার চোখে শিশুর রঙিন হাসি, বুকে ফসলের রূপকার তমোজিৎ।

পাহাড়ের গভীর খাতের কাতর যন্ত্রণা আমি এখন কিভাবে শোনাব তাকে?

পুরনো মোবাইল

কথা দিয়েছিল অতসী - সুন্দর ফাল্গুন এনে দেবে সে । আর সেই থেকে অপেক্ষা । মানুষ এক আশ্চর্য প্রাণী, পারেও বটে। হাতে পায়ে বেড়ি বেঁধে, নাকে মুখে পর্দা সেঁটে একটা বছর কাটিয়ে দিল করোনা করোনা করে।

দিব্যেন্দু বছর বছর কাটিয়ে দিল অতসীর সাথে একটা রুটি দুজনে ভাগ করে খাবে বলে । শীত বর্ষা বৈশাখের অত্যাচার পিঠের উপর দিয়ে পার করল এক গাছের তলায় দুজনে থাকবে বলে। অতসীই দিব্যেন্দুর জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে বলেছিল, 'এত বড়ো পৃথিবী । আমাদের দুজনের একটু জায়গা হবে না?'

একমাত্র দিব্যেন্দু জানে জামার বোতামে অতসীর আঙুলের গন্ধ কত মাস লেগে থাকতে পারে । দিব্যেন্দু জানে না অতসীর লিপস্টিকের দাগ জামার কলারে বেশিক্ষণ যত্ন করে রাখা যায় না ।

আশায় আশায় বয়স পেরিয়ে যায় । ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা কথা বলে না।
বৃদ্ধা মা দিব্যেন্দুর হাত ধরে কাঁদে, 'বাপ আমার, এবার একটা বিয়ে কর। আমারও যাওয়ার সময় এসে গেল । ডাক শুনতে পাচ্ছি রাধাগোবিন্দের। তোকে একা রেখে যাই কি করে বল ? কারো হাতে তোর হাত মেলাতে পারলেই আমি দুচোখ বুজব।'

চোয়াল শক্ত করে দিব্যেন্দু বলে, 'মা, অতসী বলে গেছে সে আসবে ফাল্গুন মুখে নিয়ে।' পলাশের আগুন ছুঁয়ে

অতসী বলেছিল,'যদি বসন্ত বাতাস সত্যি হয়, আমি ফিরে আসব। যদি আকাশের চন্দ্র-তারা সত্যি কথা বলে, আমি ফিরে আসব।'

অতসীর মা মারা গেলে ওর মামা এসে অতসীকে নিয়ে গেল নৈনিতাল। হাল ফ্যাশানের শহর নৈনিতাল।

যাওয়ার বেলায় চোখের জলে বুক ভাসিয়েছিল অতসী । সকাল সন্ধ্যা পথ চেয়ে থাকে দিব্যেন্দু । প্রথম তিন মাস মোবাইলে রাত জাগত
দুজনে। কি যেন আশঙ্কায় দুরু দুরু বুক দিব্যেন্দুর। অতসীর কথাবার্তায় অন্য সুর বাজে বুঝতে পারে দিব্যেন্দু । সেই প্রথমদিন থেকে প্রতিদিন শুধু শুনতে পায়, সুইচড অফ। অতসীর মোবাইল বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন । আর বাজে না বীণা। বাজে না বেহাগের সুর।

দিব্যেন্দু মোবাইলের দিকে তাকিয়ে থাকে । চেনা রিংটোনটি যদি বেজে ওঠে অতসীর স্তব্ধ মোবাইলে। সুমনা এসেছিল নৈনিতাল থেকে, দিব্যেন্দুকে বলে গেল, 'এম বিএ করে বড়ো ফার্মে চাকরী করে অতসী । স্কার্ট টপস সানগ্লাসে চেনাই যায় না অতসীকে। অতসীকে ভুলে যাও দিব্যেন্দু।'

কবে থেকে পুরনো মোবাইল হয়ে নষ্ট হয়ে আছে। মা বলেছে, 'জীবনটা নষ্ট করে দিস না, বাপ আমার। আমি মরেও শান্তি পাব না রে। কত ছেলে পুরনো মোবাইল ফেলে নতুন মোবাইল কেনে । তুইও নতুন একটা মোবাইল কেন বাপ!'

যেমন করে বৃক্ষের শাখা ভেবেছিল দোয়েল পাখিটি ফিরে আসবে। বৃক্ষের শাখা তাকিয়ে থাকে পাখিদের পথে। সুদূর সাইবেরিয়া থেকে হাজার মাইল উড়ে পরিযায়ী পাখি চেনা সরোবরে ফিরে আসে পথ চিনে । দিব্যেন্দুর বোতামে অতসীর আঙুলের চিহ্ন চিনে, জামার কলারে লেগে থাকা লিপস্টিকের গন্ধের টানে অতসী ঠিক ফিরে আসবে দিব্যেন্দুর ঘরের দরজায় । একদিন নৈনিতাল থেকে লালপেড়ে হলদে শাড়ি পরে অতসী এসে দিব্যেন্দুর সামনে দাঁড়িয়ে বলবে, 'আমি এসেছি।'

দিব্যেন্দুর মন ভালো নেই। দিব্যেন্দুর মায়ের খুব জ্বর দুদিন ধরে। রাস্তার মোড়ের দোকান থেকে রাতে মায়ের জন্য প্যারাসিটামল ট্যাবলেট কিনে আনে দিব্যেন্দুর । মাকে ধরে উঠিয়ে বসায়, গ্লাসে জল নিয়ে একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট মায়ের মুখের সামনে ধরে দিব্যেন্দু বলে, 'মা মাগো, এই ওষুধটা খেয়ে নাও। সেরে যাবে।'

মা অতি কষ্টে বলল 'সন্ধ্যায় আমি ওষুধ খেয়েছি বাবা।'

- 'কি ওষুধ খেলে? কোথায় পেলে, মা?'
- 'সুমনা আমাকে ওষুধ খাইয়ে দিয়ে গেল একটু আগে।। তোর ঘরটাও গুছিয়ে দিয়ে গেল যাওয়ার সময়।'

দিব্যেন্দু ঘরে ঢুকে দেখে বিছানার উপর একটা লাল গোলাপ। পুরনো মোবাইলটাও টেবিলের উপর তেমনই আছে। ঘড়িটাও পাশাপাশি। কলমটা? কলমটা? ওটাতেও হাতের ছোঁয়া লেগে আছে একটা রঙিন স্বপ্নের।

কনসেপ্ট

সামনের চেয়ারে বসে মনিকা মগ্ন আমার লেকচারে-

- 'দুই নৌকোয় পা রাখার' কনসেপ্ট কে যে আবিষ্কার করেছিলেন জানি না কিন্তু মনে হয় না তিনি নিউটনের

মতো গাছতলায় শুয়ে আপেল গুনতেন।'

আমার হাত থেকে কলমটি কেড়ে নিয়ে মনিকা বলল, 'আপেলটি টুপ করে মাটিতে পড়ল আর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার হল, সেটা এমন সহজ বিচিত্রবীর্যের পাটিগণিত নয়, জামাইবাবু।'

আমি ওর নাকে তর্জনীর টোকা দিয়ে বললাম, 'বিমল মাস্টারের বউ মারা যাওয়ার পরই তার ছাত্রী তনুশ্রীকে এক মাসের মধ্যে ঘরে তুললেন আর তিন মাসের মধ্যে সিঁদুর পরালেন, সে ব্যাপারটাও কি জটিল চিত্রাঙ্গদা গীতিনাট্য, মনিকা?'

মনিকা বলল, "সকলের মনের মধ্যে দুই নৌকোয় পা রাখার প্যারালাল একটা ভাবনা ঘুরপাক খায়। তবে সেটা 'চিকেন বিরিয়ানি না মটন বিরিয়ানি- কোনটা ভালো?'- এমন পিচ্ছিল নাটকও হতে পারে। আজকাল সকলেই গুরুপাক এড়িয়ে চলে।"

-'দেখিস না মনিকা, আমি কোনো গুরুপাকের মধ্যেই নেই। সহজপাচ্য হলে প্রকাশক বা প্রেমিকা দুজনেই লুফে নেয় পাণ্ডুলিপি অথবা শাড়ি। প্রুফ দেখার ঝামেলা কম। আর শাড়ির রং? সকল পুরুষ বন্ধুই বলবে, যা লাগছে না মনিকা তোকে? ঝাক্কাস। কে দিল রে?'

- 'অনলাইন মার্কেটিং আর অনলাইন যোগাযোগ! কি বিপ্লব বলো তো, জামাইবাবু?'

'তুইও কি দুই নৌকোয় পা রাখার ভাবনা শুরু করেছিস?'

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে মনিকা বলল, 'কেন, অভিক ওর অফিস কলিগ পারমিতার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে? অভিক পারমিতার মধ্যে কি এমন দেখেছে যা আমার মধ্যে নেই? বরটাকে তো ভেড়া বানিয়ে রেখেছে।'

বলতে বলতে হাতের কলমটা ভেঙে ফেলল মনিকা।

পরিবেশটা ভীষ্মদেবের ধুপঘর হয়ে গেল মুহূর্তে।

আমি কিছু বোঝার আগেই আচমকা আমার সার্ট ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে মনিকা। ওর দু'চোখে শ্রাবস্তীর বন্যা। আমি ওকে স্বান্তনা দেওয়ার জন্য সবে পিঠে হাত রেখেছি।

আর তখনই কোথা থেকে হঠাৎ আমার ঘরের চৌকাঠে পা রেখেছে অভিক। আমি কিছু বলার আগেই হতচকিত অভিক চোখ নামিয়ে ফিরে গেল কিছু না বলেই। ওর গাড়ি স্টার্ট দেয়ার শব্দ শুনতে পেলাম। এত দ্রুত গাড়ির শব্দ মিলিয়ে গেল, খুব ভয় হল। এত দ্রুত সাধারণত মহাকাশে নক্ষত্র পতনেই ঘটে।

অভিকের গাড়ি স্টার্ট দেয়ার শব্দ কতদিন আমার কানে বাজবে মেঘনাদের আর্তনাদের মতো কে জানে।

মনিকা বলল, 'আমিই দায়ী। কেন যে এতোটা ইমোশনাল হয়ে আপনার বুকে মাথা রাখতে গেলাম। আমার তো ইমোশন বলে কিছুই নেই- অন্তত অভিক তাইই বলত।'

পারমিতা আমাকে জীবনানন্দের বই ফেরত দিতে এসে বলে গেল সেইই দায়ী। এ নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা আমার সঙ্গে সময় কাটাল। যাবার সময় বলল, 'জানেন অভিক আর আমার মধ্যে কোনো ইমোশনাল বন্ডিং ছিল না। আবার পুরো ফিজিক্যালও নয়। দুটোই ছিল হয়তো। দুটোই না থাকলে আমার এতো ক্রেজ কেন? আপনি তো মানুষকে বোঝেন। একটু বলবেন, কেমিস্ট্রিটা কি?'

আমি উত্তর দিলাম না। নীরব শ্রোতা থাকলাম। না হলে ওর কথা শেষ হত না। আরও কিছুক্ষণ থাকত। আমি আপাতত সেটা চাইছিলাম না। কারণ আমি আপাতত ইমোশনেও নেই, ফিজিক্যালেও নেই। সব কিছু নেই বললে মিথ্যে বলা হবে- টাইম পাস বলে একটা কথা তো আছে। আজকাল টাইম পাসও কিন্তু একটা প্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেটা পারমিতা ও মনিকা দুজনের প্রতি আমার এবং ওদের দুজনের আমার সাথে কথা বলার স্টাইলে একটা আর্দ্র পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।

আগামী সোমবার অভিকের মৃত্যু বার্ষিকী। ওর বাবা বলে গেল ।

ঋতিকা এখন অপেক্ষা করতে শিখেছে। মনে ও শরীরে । চাওয়া ও পাওয়ার মাঝে সময়টুকু হচ্ছে অপেক্ষা । আবহমান কাল থেকে প্রকৃতি বলছে ধৈর্য্ ধর, আমিই তোমাকে সব দেব।

ঋতিকা আমাকে বলল,'আপনি যা বলবেন আমি তা আগেই বুঝতে পারি। সান্ত্বনা আর অজুহাত একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। দুটোই দুর্বল মানুষের ব্রেকফাস্ট। ওই নিয়ে সে সারাদিন বাঁচে। শুনে রাখুন, বিনায়ককে আসতেই হবে আমার কাছে। মক্ষী ও মধুর মোহ দেখে ছাড়ব। পূর্ণিমায় আমিই রানী'।

আমার হাতে একগোছা রজনীগন্ধা দিয়ে হনহন করে চলে গেল ঋতিকা। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'আপনি আমার এক দুর্বল দেবতা। আপনাকে নিয়ে আমার কোনো ভয় নেই'। ঋতিকার অভিমান সাময়িক, যুক্তি প্রবল।

সন্ধ্যায় ফোন আসল,'আমার অফিসে চলে আসুন। কফি খাওয়াব'।

বললাম, 'ড্রাইভার ছুটিতে । আজ থাক'। ঋতিকা বলল, 'আজ থাকবে কেন? গাড়ি পাঠাচ্ছি। কফি আর গল্পই তো শুধু '।

রানু ও রোদ্দুর

শীতের সকালে দীপু আমার সামনে দাঁড়ায় রোদ্দুরগুলো আড়াল করে। সবটা যেন ওরই চাই। আমি বললাম, 'একটু সরে দাঁড়াও, কিছু তুমি নাও, কিছু আমাকে দাও'।

আমরা সবাই মনের মধ্যে এক পশলা শুদ্ধ একটু রোদ্দুর চাই। অনেক সময় আমরা পবিত্র একটা মন চাই অন্যের কাছে। এদিকে আমি যে সেই দৈন্যদশায় হাবুডুবু সেলুকাস, কেউ কি জানে !

সকাল বেলায় আমার ছাদে আকাশ চিরে এক অ্যালবাম গানের মতো একঝাঁক রোদ্দুর । রোদ্দুর তো নয় যেন বকবকম পায়রা । টি-টেবিল আর চেয়ার পেতে ছাদেই আমাদের প্রভাতী সংসার । দীপুর হাতে সদ্য টোস্টার থেকে বেরিয়ে আসা গরম টোস্ট আর লিকার চায়ে আমাদের জমজমাট ইন্দ্রপ্রস্থ।

ও বাড়ির ছাদে চোখ আমার ইনিয়ে বিনিয়ে যাবেই যাবে। দীপু লক্ষ্য করে কি না জানি না। দীপুর উদারতা নিয়ে প্রশ্ন আমার চিরদিনের, আর দশটা প্রতাপাদিত্যের মতোই। আমার চোখের উপর গোয়েন্দাগিরি করে না –এটা হয়তো বা নিছক আমার আত্মতুষ্টি ।

মেয়েরা সব বোঝে। বলে না কিছু।

- 'তাই তো করে খাচ্ছো, প্রাণনাথ। লাটাইটা যে আমার হাতে। যাবে কতদূর!'

ওই ছাদে যে গোলাপ ফোঁটে রোজ সকালে আমি আসার আগে অথবা একটু পরে- লাল গোলাপ ! গন্ধ না পাই, রং তো টানে চায়ের ফাঁকে চোখটাকে ।

- অ্যাপোলো হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স পাড়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে খানিকক্ষণ - হবে হয়ত কারো কিছু, অসুখ বিসুখ - বা কারো পত্নীবিয়োগ।

গোলাপ ফোঁটেনি ওই ছাদে আজ কাল গত পরশু।

দীপুও বিষণ্ণ মনে চা রেখে নেমে যায় নিচতলায়, কখনও এক ফ্লাস্ক চা নিয়ে ও বাড়ির অন্দরে।

আমার গরম টোস্ট ঠান্ডা হয় ঔদাসীন্যে। শূন্য হয়েছে চায়ের কাপ অনেকক্ষণ। দীপু যখন আড়াল করত শীত রোদ্দুর, গোলাপটাকে ঢাকতে গিয়ে ঢেকে দিত সকালবেলার অনুগল্প।

রাতের বেলা খাবার টেবিলে বিষণ্ণ মনে দীপু বলে, 'ও বাড়ির রানুদি অ্যাপোলোর আই সি ইউ তে । ভালো নেই।'জানতে পারলাম লাল গোলাপের পাপড়িগুলো এমনই হয়- কখনও কখনও তার নাম রানু।

দীপু গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অ্যাপোলোর বিষাদময় বারান্দায়। দীপুর আঁচল ধরে রানুদির ছয় বছরের ছোট্ট ছেলে দীপঙ্কর।

বিবর্ণ চিঠি

বিবর্ণ চিঠির নানান রকম অভিধান। মূল কথা চিঠির বুকে তখন পুরোনো একখানি ব্যথা। যার হাতে চিঠি তিনিও প্রাচীন বটবৃক্ষ। আর তার চশমার ফ্রেম সেটাও হরপ্পা মহেঞ্জোদারো।

শোনো সিদ্ধার্থ, সময়ে কেউ চিঠির অক্ষরে হাত বুলিয়ে দেখোনি। এখন নতুন সংস্করণ সন্ধানে তোমাদের কত রঙ কত তামাশা।

শীতের বাজারে সকলে নতুন বই খোঁজে। নতুন বইয়ে লেগে থাকে বাসররাতের লালশাড়ির মিষ্টি গন্ধ । পাশাপাশি পুরোনো বই বিবর্ণ চিঠির মতো উপোষী নীলাবৌদি। দাম্পত্য কলহের অসংলগ্ন পাহাড়ি সংলাপ ।

সেদিন কমলনাথ বলেছিল, 'বুঝলেন, আমি যদি ফিরে যেতে পারতাম কৈশোরে, জীবনটাকে ভেঙে ভেঙে রঙ মাখাতাম ভাঁজে ভাঁজে। আর আমি টাটকা বৃষ্টির জলে স্নান করতাম। মাঝ রাতে বৈশালীকে ঘুম থেকে টেনে তুলতাম না। মাটির পুতুল ভাঙার পর পাশ ফিরে ঘুমোতাম না।'

আমি ওর লেকচার থামিয়ে দিয়ে বললাম, 'শোনো, এসব কথা শিক্ষিত পুরুষের চিরায়ত বাহানা । সবাই যৌবনকে পৌষের পিঠেপুলির মতো ভোগ করেছে। সব ফুরিয়ে গেলে তখন জয় জগন্নাথ'।

সেবার তপোবনে বাল্মিকী মুনির আখড়ায় পূর্ণিমা রাতে দীপুর হাত ধরে যেই সবে চাঁদের চোখে চোখ রেখেছি হঠাৎ দেখি কমলনাথ। বিবর্ণ চিঠি হাতে তপোবনে কমলনাথ খুঁজে চলেছে বৈশালীর পায়ের আওয়াজ । দীপু বলল, 'দেখেছ, কি শক্ত হাতে ধরে আছে বৈশালীর শেষ চিঠি।'

মাধু ও প্রজাপতি

রঘু বলেছিল, 'পাঞ্জাবি না পরলে কবি হতে পারবেন না, দাদাবাবু।' রঘুর কথাটা প্রাণে না ধরলেও আমার মনে ধরেছিল। প্রাণ সে তো জীবনধারণের জন্যে শালপাতায় মোড়া রুটি তড়কা কাঁচা লঙ্কা। আর মন সে শুধু রঘুর মতো বাউন্ডুলেদের খুঁজে ফেরে দিবানিশি।

রঘুকে বলেছিলাম,'রঘু, পাঞ্জাবির কথাটা তোকে কে বলেছিল রে?' কান চুলকে, হাত কচলে বলেছিল, 'মাধু- আমার মাধবীলতা বলেছিল, বাবু।'

হাত কচলে, কান চুলকে এত মিষ্টি করে মাধু শব্দ উচ্চারণ করলে বুঝতেই হবে রঘুদের এ প্রেম এক্কেবারে কোহিনুর হীরে।

সেদিন রঘুর হাতে এক হাজার টাকা দিয়ে বলেছিলাম,'তুই একটা পাঞ্জাবি কিনে পরিস। দেখবি একদিন তুইও ঠিক কবি হয়ে গেছিস।'

সলজ্জ রঘু টাকাটা নিতে ইতস্ততঃ করছে দেখে ধমক দিয়েছিলাম। এ ধমক মধু মাখা টুনটুনি পাখি।

ক'দিন পর এসে বলল, 'একটা পাঞ্জাবি কিনেছি দাদাবাবু, আর একটা মালা কিনে দিয়েছি মাধুকে।'

- 'বাহ্ পাঞ্জাবি পরে তুই তো কবি হয়ে গেছিস রে, রঘু।'

- 'বাবু, মাধুর গলায় মালাটা পরিয়ে দিয়েছি। আর মাধুকে নিয়ে একটা কবিতাও লিখে ফেলেছি - একটা মিষ্টি কবিতা। তোমার মতো খটমটে কবিতা না' ।

নতুন পাঞ্জাবিতে ডগমগ রঘু। ওর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে মনে হচ্ছিল যেন এখনি একটা সনেট লিখে ফেলতে পারে।

এক নির্জন দুপুরে এসে দেখি আমার বুকশেলফের আড়ালে রঘু আর বিগলিত মাধু।

রঘু কবিতা শোনাচ্ছে, -

'মাধু আমার টিয়াপাখি
সে যে আমার প্রাণের সখি,
মাধু আমার নয়নমণি
সে তো আমার বকুল রানি।।

রঘু বলেছিল 'মুখে কাপড় বেঁধে ধুলো ঝাড়তে হয়, দাদাবাবু। না হলে এ বাড়িতে প্রজাপতি আসবে না।'

আমার বুকশেলফে দিনে দিনে জমেছে অনেক ধুলো। কবিতায় কবিতায় পুরু আস্তরণ।

সেদিন নিঝুম দুপুরে রঘুর চোখের কোনে চিকচিক জল।

-'কি রে রঘু? এ কি অবস্থা তোর! তোর মাধু কেমন আছে?'

- 'আমি তো কোনো কাজ করি না, দাদাবাবু। মা বলে, আমি বাউন্ডুলে। তাই আমাদের বাড়িতে কোনো প্রজাপতি নাচে না। মাধু ওর দূর সম্পর্কের পিসতুতো দাদার সাথে পালিয়েছে, বাবু। ব্যাঙ্গালোরে মশলার ব্যবসা করে।'

আমি বললাম, 'রঘু, পুরুষ মানুষের কাঁদতে নেই রে। দেখিস একদিন একটা সাতরঙা প্রজাপতি তোর ঘরে ঠিক আসবে।'

অভিযোগ

তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আমার একশো একটা । আমি বিশ্বাস করতাম যে যারা বারবার অভিযোগ করে তারা দুর্বল চিত্তের, তারা অতিশয় চিকন মনের মানুষ। এটাই ভাবতাম যে মেরুদণ্ডহীন তারা। নিজেরা মোকাবেলা করতে পারে না তাই অভিযোগ করে । আমার করপুটে শক্তি সঞ্চয় করছি একদিন আমার সজীব ইচ্ছেগুলো উপহার দেব তোমাকে। অন্তত: একটা তাজা স্বভূমি রেখে যাব তোমার পলিমাটিতে।

এটা আমার অনুভব- যার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ তার প্রতি তত আকর্ষণ, তত অধিকার, ততটাই রক্তক্ষরণ হৃদয় অন্দরে । এটা তো ঠিক আমরা জন্ম নিয়েছি প্রতিদিন একটু একটু করে হারানোর জন্যে। বেড়ে উঠি একটু একটু করে দেবার জন্যে । এ নিয়মের বাইরে কেউ যেতে চাইলে যেতে পারবে না। কেউ যদি জোর করে যায়ও সেদিনই সে মনুষ্যত্ব শব্দটা ক্রমান্বয়ে হারাতে থাকবে।

যদি কোনদিন ভুল করে সে বলে ফেলে, 'আমি সব পেয়েছি।' সেদিন বুঝবে সে সত্যিটাই বলে ফেলল, 'আমি সব হারিয়েছি ।' তখন তেল বিহীন প্রদীপের সলতের মতো আলোটুকু ধরে রাখা প্রাণপণে । প্রদীপও জানে, সলতেও জানে, আমাদের দিন ফুরিয়েছে ।

ঘষামাজা করে দিন গুজরান হতে পারে, হীরের আংটি হবে না। রানীমার দেখাও পাবে না ।

জীবন মানে অপেক্ষা । জীবন মানে অভিমান, জীবন মানে অভিযোগ এবং জীবন মানে স্বপ্নের প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য । কেউ নিঃস্ব না হলে তার পূর্ণতা আসে না। সব পেয়েও যখন সে দেখতে পায় যে সব কিছুতেই তার ঠুনকো আধিপত্য, তখনই সে রাজাধিরাজ । তুমি তো জানো, আমাকেও একটা রাজাধিরাজ ভাবতে বড়ো শখ?

একশো একটা অভিযোগ লেখা চাদরখানি যেদিন এক ঝটকায় তোমার মুখের উপর থেকে সরিয়ে নিতে পারব, সেদিন তুমি দেখতে পাবে- আমি এক সম্পূর্ণ মানুষ ।

পথের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, পথ তুমি কেন ফুরিয়ে যাচ্ছ? আমি যে আরও অনেকটা পথ হাঁটতে চাই। আরো দ্রুত চলতে চাই। কত দেখা, কত শোনা, কত কথা বাকি রয়ে গেল- পথের ধারে বুনো গন্ধ, অনাদরের ভাঁট ফুল, শ্রীলংকার প্যাগোডা, চিলির উষ্ণস্রবণ এমনি আরও কত কি।

সুইজারল্যান্ডের কফি আড্ডায় এলিনা বলেছিল, সামনের বছর তোমাকে নিয়ে নায়াগ্রা ফলস দেখতে যাব, তারপরের বছর যাব বার্লিনের অপেরা দেখতে, তারপর আফ্রিকার জঙ্গল।

এলিনার সোনোগ্রাফি রিপোর্টে যখন জানলাম, ওর কিডনিতে স্টোন, আমার সারারাত ঘুম আসেনি। খুব ভোরে মন্দিরের কাঁসর ঘন্টা শুনতে পেলাম, তখনও ভাবছি যদি

একটু ঘুমোতে পারতাম। ঘুম আসেনি। একসময় জানলা দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকে জানান দিল, উঠে পড়। সারাদিন তোমার অপেক্ষায়। মানুষ তোমাকে খুঁজছে। পথ তোমাকে ডাকছে। কোনোদিন হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় বসব না- প্রভু, আমাকে শক্তি দাও।

- এটা কোনো প্রার্থনা নয়,

এটা একটা নিরন্তর আশাবাদ।

এটাই মানুষের অনুতাপ যা সুখের সময় আপনজনকে ভুলায়।

এটাই মানুষের অভিযোগ যা দুঃখের সময়ও রঙিন স্বপ্ন দেখায়।

যতদিন তোমার বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ থাকবে ততদিনই তুমি আমার নিকটবর্তী পরমাত্মীয়।

বাঁশির বিরুদ্ধে রাখালের অভিযোগ, বাঁশিতে কেন আরও মোহন সুর ওঠে না? এ বাঁশির সুর শুনে কেন এ দুপুর মাতাল হয় না ? বাঁশিটি রাখালের পরমাত্মীয়।

আজ সকালে এলিনাকে সাহস দিলাম, 'কিডনি স্টোন কিচ্ছু না আজকাল। কত সহজ চিকিৎসা আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'লিথোট্রিপসির কথা বলছ ? হাসপাতালে তো যেতে হবে। কিডনির স্টোন সারাতে গিয়ে করোনা বাধিয়ে মরব।'

'আমি আছি না? আমি পাশে থাকলে মরবে না। করোনা তোমার পাশে ঘেঁষবে না।'

এরপর দুজনে অনেক হাসলাম। কতদিন আমরা এমন হাসি না, শুধু দুজনে অভিযোগ নিয়েই থাকি।